পঞ্চপুষ্প।

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ দেব
প্রণীত।

শ্রীবঙ্কবিহারী বসু, বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে
শ্রীকিশোরীমোহন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

শ্রীচরণ

স্মরণ করিয়া,

"পঞ্চপুষ্প"

লিখিত হইল।

চিরসেবক

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ দেব।

ভূমিকা।

"পঞ্চপুষ্প" নাম দিয়া, পাঁচটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। ইহাতে সামাজিক, সাহিত্য এবং শিক্ষাদিবিষয়ে কতকগুলি স্থূল কথার অতি সংক্ষেপ উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। ইহা জনসাধারণের অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পাঠোপযোগী হইলে শ্রম সার্থক হইবে, এমত আশা করা যায়।

কলিকাতা,
সভাবাজার রাজবাটী।
২৩এ অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সাল।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
আলোঢ়িত	আলোচিত	১৫	৯
ভরতবর্ষের	ভারতবর্ষের	১৯	৯
ধর্ম্মব্যবসায়ী	চর্ম্মব্যবসায়ী	২২	১৫
মাহাত্ম	মাহাত্ম্য	২৫	২৫
মনুয্য	মনুষ্য	২৯	৯
স্মতি	স্মৃতি	৩১	১
নিজ পুত্রের	পিতা-পুত্রের	৩৪	৫
অবনতিতেকোন্	অবনতিতে কোন্	৩৭	১১
পুন-রভ্যুদয়ে	পুনরভ্যুদয়ে	৩৭	১২
বিস্তৃত	বিস্তৃত	৪০	৭
মনুষ্য, জীবনের	মনুষ্য-জীবনের	৪৭	৪
দর্শনিকগণ	দার্শনিকগণ	৫৭	২২
বিষদৃশ	বিসদৃশ	৫৭	২৩
ভাবা আশা	ভাবী আশা	৬৬	১২

পঞ্চপুষ্প।

ইতিবৃত্ত পাঠের ফল।

করুণাময় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় মনুষ্য যে, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সুখ উপভোগ করিতেছে, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বেশ অনুভূত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা যেন ভূমণ্ডলে জীবশ্রেষ্ঠ মানবের সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যাবতীয় পদার্থের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। দিবস রজনী, অথবা ঋতুগণের—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—একের পর একের আবির্ভাব জীবের মঙ্গলের হেতু এবং পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত নির্ণীত হইয়াছে। আবার মহাঘোর ভীষণ ঝটিকা, ঘন ঘন বিদ্যুত-চিহ্ন, অশনি-সম্পাত ও ভূমিকম্প কর্ত্তৃক পরিণামে জীব-বৃন্দের সুখ বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনার্থ যেন সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অগণিত তারকাবৃন্দে পরিবৃত সুন্দর নীল নভোমণ্ডল, মধ্যে মধ্যে পাদপরাজি-সুশোভিত শ্যামল ক্ষেত্র ও বায়ুহিল্লোলে সঞ্চালিত নবকিসলয়ের মর্ম্মর ধ্বনি এবং বিহঙ্গমগণের শ্রুতিসুখকর কূজনে অথবা স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর কুলুকুলু ধ্বনিতে কাহার না মন বিশ্বপ্রেমে মোহিত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট হয়? স্বভাবের এইগুলির আলো-চনায় সৃষ্টিকর্ত্তার গভীর বুদ্ধি ও অসীম দয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড়জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে সুন্দর প্রণালী অনুসারে পরস্পর পর-স্পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে, উহা হইতে আমাদিগের এই ধারণা হয় যে, মনুষ্য পরস্পরের সুখসাধনে সততই চেষ্টিত থাকি-বেন। অতএব যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছা কর্ত্তৃক মনুষ্য সৃষ্ট ও জীবশ্রেষ্ঠ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ও জীব সমুদয়ের সম্মুখে

আমাদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে যে, আমরা প্রত্যেকেই স্বকীয় সাধ্য অনুসারে পরস্পরের প্রীতি, মঙ্গল ও সুখ সাধনে যত্নশীল হই।

এই প্রস্তাবের অর্থাৎ "ইতিবৃত্ত পাঠের ফল" আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা পরস্পরের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হই। কি সভ্য, কি অসভ্য সমগ্র মনুষ্যজাতির আচার-প্রণালী, কার্য্যকলাপ ও সামাজিক বিধিগুলির পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদিগের মৌলিক উদ্দেশ্য যে, জীবের মঙ্গল সাধন, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুপ্রসিদ্ধ লর্ড বেকন কহিয়াছেন, মনুষ্য-চরিত্র-জ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চরম জ্ঞানস্বরূপ। ইতিবৃত্তের আলোচনায় সুদ্ধ বিশেষ বিশেষ মনুষ্য কেন, জাতির, মনুষ্যবৃন্দের কার্য্যকলাপ, চরিত্র, এবং মতবাদ বিশেষরূপে শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধীয় সার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি আমার কথা বলিতেছি না, বিজ্ঞ আর্ণল্ড্ সাহেব ইতিবৃত্তের ফলোপধায়কতা বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকটিত হইল। তিনি কহেন, "মনুষ্যমণ্ডলীর সমগ্র চিন্তা ও কার্য্যের শেষ ও চূড়ান্ত কারণ, বিশ্বপাতার গৌরব এবং মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম উৎকর্ষতা বা সম্পূর্ণতার মধ্যে যে মহত্ব বিরাজিত, তাহাই ইতিহাসের মহত্বের পরিমাপক।"*

ইতিবৃত্তের আলোচনায় মনুষ্যের কার্য্যের এবং জীবনের নানাপ্রকার বৈষম্য দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের জীবনের পরীক্ষা ও কার্য্যাবলী দর্শনে আমাদিগকে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পাশবিক বলের উপর নৈতিক সাহসের (Moral courage) প্রাধান্য, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি দৃষ্টিদানে বেশ উপলব্ধি হয়। নৈতিক সাহস দ্বারা মনুষ্য অশেষ প্রকার বিঘ্ন, বাধা, বিপদ হইতে উত্তীর্ণ

* Whatever there is of greatness in the final cause of all human thought and action God's Glory and Man's Perfection that is the measure of the greatness of History. (Lectures on Modern History by Thomas Arnold. Sixth edition p. 21.)

হইতে পারে, নৈতিক সাহস সূত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মনুষ্য মধ্যে দৃশ্যমান হয়, নৈতিক সাহসবলেই মহা মহা বিপদ মধ্যে মনুষ্যের মহত্ব প্রকাশ পায়, এবং নৈতিক সাহস হইতে সদাই শুভফল প্রসূত হয়। পাশবিক বল অশেষ প্রকার বিপদের আকর। পাশবিক বল, মনুষ্যকে বিপদ মধ্যে পতিত করে, এবং বিপদে পতিত হইলে কি করা কর্ত্তব্য, নৈতিক সাহস তাহার বিধান দেয়। পাশবিক বলের ব্যবহারে মনুষ্যের মন ক্রমিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। অপরটীর ব্যবহারে মনুষ্যকে ক্রমিক মহান্ ভাবে যথার্থ মনুষ্যত্বে লইয়া যায়।

যে সময়ে রোম-সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভিরাস, পারস্যজাতির সহিত যুদ্ধনিবন্ধন আণ্টিয়ক (Antioch) নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি সেনা, স্ত্রীলোকদিগের স্নানাগারে প্রবেশ করায়, তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান ও সৈন্যগণ মধ্যে দৃঢ়রূপে কঠোর সুরীতি নীতি (discipline) প্রচলন করিয়াছিলেন। রোমের সৈন্যগণ সে সময়ে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় পদার্পন করিয়াছিল। এমন কি, যে সম্রাট তাহাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য না করিতেন অথবা তাহাদিগের মনোমত না হইতেন, তাঁহার পক্ষে রাজ্যশাসন-শক্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছিল। সৈন্যবর্গ তাহাদিগের সঙ্গীগণের মধ্যে কতকগুলির শাস্তিবিধান ও সাধারণ্যে দৃঢ়রূপে কঠোর সুরীতি নীতি প্রচলনের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া, সম্রাটের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইতে লাগিল ও অবশেষে সম্রাটকে বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভিরাস, তাহাদিগের ভয়প্রদর্শনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "তোমরা পারসীয়ান, জর্ম্মন ও সারমেশীয়দিগের বিরুদ্ধে সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হও। তোমাদিগকে যিনি রাজ্যের অর্থ, শস্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়া পালন করিতেছেন, সেই উপকারক ও সম্রাটের সম্মুখে চীৎকার করিও না, ক্ষান্ত হও। যদি তোমরা নিস্তব্ধ না হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে রাজ্যের সৈন্য বলিয়া গণনা না করিয়া, দেশের অতি নীচ ও হেয় অধিবাসী বলিয়া বিবেচনা করিব।" সম্রাট

আলেকজাণ্ডার সেভিরাস একক সমবেত শত সহস্র সৈন্যের মধ্যে থাকিয়া নির্ভীকচিত্তে এরূপ আচরণ প্রদর্শন করিলে, তাহাদিগের ক্রোধ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হইল ও তাহারা সম্রাটের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করিল। কিন্তু নির্ভীক আলেকজাণ্ডার পুনরায় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস প্রদর্শন করিলেই তোমাদের সাহসের সদ্ব্যবহার করা হয়; আমাকে তোমরা এখনি সংহার করিতে পার, আমাকে বৃথা এরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও আমাকে সংহার হেতু তোমাদিগের যে পাপ হইবে, তাহার দণ্ড রাজ্য মধ্যে ভোগ করিতে হইবে।" সৈন্যগণ ইহাতেও বিদ্রোহীভাব প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত না হওয়ায়, সম্রাট উচ্চৈঃস্বরে এই আদেশ করিলেন, "অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, এখনই স্ব স্ব বাসস্থানে স্থিরভাবে প্রস্থান কর।" সৈন্যবৃন্দের সেই উত্তেজনারূপ প্রবল বাত্যার তৎক্ষণাৎ উপশম হইল। সৈন্যবর্গ, সম্রাটের এই প্রকার সাহস ও নির্ভীকচিত্ত অবলোকন করিয়া, লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনাদিগের দোষ বুঝিতে পারিল এবং সেইস্থলে অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ-পতাকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারা শিবিরে পুনঃ প্রবেশ না করিয়া, রাজ্যের নানা পান্থশালায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।* যাঁহারা রোমের সৈন্যবর্গের অত্যাচার ও

* "Reserve your shouts," said the undaunted Emperor, "till you take the field against the Persians, the Germans and the Sarmatians. Be silent in the presence of your Sovereign and benefactor, who bestows upon you the corn, the clothing and the money of the provinces. Be silent, or I shall no longer style you soldiers but citizens, if those indeed who disclaim the laws of Rome deserve to be ranked among the meanest of the people." His menaces inflamed the fury of the legion and their brandished arms already threatened his person. "Your courage" resumed the intrepid Alexander, "would be more nobly displayed in the field of battle; me you may destroy, you cannot intimidate; and the severe justice of the republic would punish your crime, and revenge my death." The legion still per-

স্বেচ্ছাচার বর্ণন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, আলেকজাণ্ডার সেভিরাস নৈতিক সাহস সূত্রে দুর্দ্দমনীয় সৈন্যবর্গকে কি করিয়া বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি সম্রাট ইলাগিবেলাসকে সংহার করিয়াই উক্ত সৈন্যবর্গ, আলেকজাণ্ডার সেভিরাসকে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। সে সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি, সৈন্যবর্গের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন, তাঁহাদিগেরই রাজ্যের সম্রাট হইবার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবিক নৈতিক সাহস সূত্রে মনুষ্য কি কাণ্ড সাধন করিয়াছেন, ইতিহাস মধ্যে তাহা পাঠ করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত এবং প্রত্যেক লোকেরই হৃদয় নৈতিক সাহসে আপ্লুত হইয়া যায়। থার্মপিলির ব্যাপার পাঠে কাহার না হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠে? লিওনিডাস ও তাঁহার কেবলমাত্র তিন শত সঙ্গী, পারস্য সম্রাটের অক্ষৌহিণী সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়া, জগতে অনন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। থার্মপিলির নাম মনুষ্য হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মেক্সিকো-বিজেতা বীর কোর্টিসের মেক্সিকো বিজয় পাঠে আবার নৈতিক সাহস সূত্রে কি ব্যাপার সাধিত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। বীর কোর্টিসের সমগ্র বিবরণী পাঠে এরূপ ধারণা হয় যে, অশেষবিধ বিঘ্ন-বাধা-বিপদ তাঁহার জীবনের একপ্রকার সঙ্গীস্বরূপ ছিল। বিঘ্ন-বাধা-বিপদরাশি তাঁহার নৈতিক সাহসকে কিছুতেই বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। আমেরিকার মেক্সিকো নগরে অবতীর্ণ হইয়াই উক্ত নগর অধিকার করিবার কামনা তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ

---

sisted in clamorous sedition when the Emperor pronounced with a loud voice, the decisive sentence: "Citizens! lay down your arms and depart in peace to your respective habitations." The tempest was instantly appeased. The soldiers, filled with grief and shame, silently confessed the justice of their punishment, and the power of discipline, yielded up their arms and military ensigns, and retired in confusion, not to their camp, but to the several inns of the city. (Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol I. pp. 198-199.)

করে। পরে মেক্সিকোবাসীগণের প্রভূত ক্ষমতা ও শাসনশক্তি দর্শনে এবং আপন লোকবলের অভাব সত্ত্বেও তিনি অভীষ্ট কামনাটী পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য নগর আক্রমণ কালে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইলেও তাঁহার নৈতিক সাহস কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অবশেষে কেবল একমাত্র নৈতিক সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই মেক্সিকো নগর অধিকার করেন, ইহার সবিস্তার বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করা যায়। এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল ইতিহাসলেখক কহিয়াছেন যে, বোধ হয় জগতের মধ্যে এমন আর একটী নিদর্শন পাওয়া যায় না, যথায় অতি সামান্য উপায় অবলম্বন করিয়া, এরূপ দুরূহ ব্যাপারে এত অধিক পরিমাণে সফলতা লাভ হইয়াছে। বীর কোর্টিসের বিপদের চিত্র সকল দর্শন করিয়া, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যদি তাঁহার হৃদয় মধ্যে নৈতিক সাহস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল না থাকিত, তাহা হইলে, স্বদেশ হইতে বহু দূরদেশে গমন করিয়া কেবল চরিত্র,শিক্ষা, বুদ্ধি, সাহস প্রভৃতি গুণহীন অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও এত অধিক পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারিতেন না।

রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতাগণের বনে বনে দিন যাপন, অজ্ঞাতবাস ও মহাপরাক্রমশালী দুর্য্যোধনের সেনা সমূহকে পরাজয় পাঠে পাশবিক বলের উপর নৈতিক সাহসের প্রাধান্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

দেখা যায়, এ জগতে ভাগ্যলক্ষ্মী সকলের প্রতি সমান কৃপা-কটাক্ষপাত করেন না। হৃদয়ভেদী দরিদ্রতার ভীষণ ভ্রুকুটী অনবরতই মনুষ্যের ধৈর্য্য, সাহস, শক্তি ও উদ্যমকে হীনবল করিতে চেষ্টা করিতেছে। যদি এ জগতে মনুষ্যসাধারণ মধ্যে নৈতিক সাহস ও আত্মনির্ভর, পবিত্র শান্তি বারি বর্ষণ না করিত, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের আদর্শ অভাবে সমগ্র মানবজাতিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতে হইত! সমগ্র মানবজাতির হিতসাধক মহাপুরুষগণ মনুষ্যদিগের উন্নতির চিহ্নস্বরূপ যে সমস্ত নানা প্রকার জ্ঞানরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ এ জগতে প্রোথিত করিয়া, সমগ্র মানবের পূজনীয় ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন,

সেই সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ আজ আমরা কোথায় দেখিতে পাইতাম? কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি যথার্থই কহিয়াছেন, সদ্গুণ কর্তৃকই মনুষ্যত্ব লাভ হয়, এবং তদভাবেই অসারতা প্রাপ্তি ঘটে।

প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, বীরপ্রসবিনী রাজবারায় মিবারের রাণা প্রতাপ সিংহ ও রাজপুতগণের অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র রাজবারা ও মিবার মধ্যে এমন কি হলদীঘাটেও তাঁহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কালের করাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস তাঁহাদিগের মাতৃভুমির নিমিত্ত অসহনীয় ক্লেশ স্বীকার, অসভ্যদিগের মধ্যে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও অপূর্ব্ব জীবনোৎসর্গের বিষয় জ্বলন্ত অক্ষরে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রাণা প্রতাপ সিংহ জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজপুতগণ যথার্থই জগতের সকল জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত টড সাহেব, রাজস্থানের বিবরণীতে এই মর্ম্মে স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন যে, স্বদেশ-প্রেমিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বীর লিয়োনিডাস থার্ম্মপিলিতে যেরূপ কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজস্থানের এমন কি প্রতিক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যেও ঐরূপ কীর্ত্তিকর কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। রাজপুতদিগের এই সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনী পাঠে কাহার না হৃদয় স্বদেশপ্রেমে উৎফুল্ল হয়?

কার্থেজবাসীগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, কার্থেজনগরের নিকট জন্মের মত বিদায়গ্রহণ কালীন বীরপ্রবর হানিবলের "হে ভগবন্! কার্থেজনগর যেন আমার অভাব বোধ না করে।" এই উক্তিটি পাঠে কাহার না হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি মমতার উদ্দীপন হয়?

বাস্তবিকই ইতিহাস পাঠে মনুষ্যের হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি মমতা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং মনুষ্যকে স্বদেশপ্রেমী করিয়া তুলে। যে সময়ে স্পেন-নরপতি ফিলিপ, ইংলণ্ড অধিকার লালসায় প্রসিদ্ধ "আরমাডা" প্রেরণ করেন, সে সময়ে স্বদেশ রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের উদ্যম ও "আরমাডা" ধ্বংসের সহিত ফিলিপের ইংলণ্ড অধিকার-আশা নিরাশায় পরিণত করিবার বিষয় পাঠ করিলে, কোন্ জাতির মনুষ্যসাধারণের মধ্যে

জাতির দায়িত্ব শিক্ষা লাভ না হয়? ইংরাজ শুদ্ধ রাজ্য অধিকার সূত্রে জগতের প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সকল প্রকার শিক্ষিত চরিত্রবান্ মহাত্মাগণের কার্য্যকলাপ পাঠ করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। কি অসাধারণ অধ্যবসায়, কি অমানুষিক সাহস, কি তেজস্বিতা, কি স্বাবলম্বন, কি অন্যান্য সদ্গুণ সমূহ, এই সমস্তই ইংরাজ জাতিকে সুশোভিত করিয়া জাতিশ্রেষ্ঠ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বীরপ্রবর নেলসনের "ইংলণ্ড, তাঁহার পুত্রেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবে, এরূপ আশা করেন।" এই উক্তিটী পাঠ করিলে, স্বদেশের জন্য অধিবাসী সমূহের দায়িত্ব কিরূপ আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

মনুষ্য-স্বভাব এরূপ সুন্দর প্রণালীতে গঠিত যে, আমরা সকলেই পরস্পরের স্বভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে পরস্পরের অনুকরণ করিতে থাকি। ইতিবৃত্তের আলোচনায় জাতি মধ্যে মনুষ্যের কি কি স্বত্ব ও দায়িত্ব বিরাজমান, তাহা সবিশেষ জানিতে পারি। যে শিক্ষা-সূত্রে মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, যে জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যগণ হিতাহিত বুঝিয়া কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতেছেন, যে বিজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্যের যাবতীয় অভাবের পূরণ হইতেছে ও স্বাভাবিক ঘটনাবলীর তথ্য নির্ণয় হইতেছে, তৎসমস্তের প্রয়োজনীয়তার অতি সুন্দর পরিষ্কার বর্ণন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মনীষী এইরূপ বলেন যে, ইতিবৃত্ত কোন বিষয়ের আবিষ্কার করে না, উহাতে কেবলমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ হয় মাত্র। উক্ত উক্তিটী যথার্থ হইলেও ইতিবৃত্তের গুরুত্ব হ্রাস হইল, এরূপ ধারণা মনোমধ্যে স্থান দেওয়া কিছু নহে। কারণ মহামনীষী সিসিরো যথার্থই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে যে সমুদয় কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অবগত না হইলে, শিশুর ন্যায় মনুষ্যকে অজ্ঞ থাকিতে হয়। পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রমসাধিত শিক্ষা ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না করিলে, মনুষ্যকে চিরকালই জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় থাকিতে হইত। জর্ম্মণ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সচিবপ্রবর প্রিন্স

বিসমার্ক কোন স্থলে বলিয়াছেন, "আমি অপরের ভ্রম দর্শনে আপনার ভ্রম সংশোধন করি।" মনুষ্যবৃন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যগণের ভ্রম দেখিয়া, সতর্কভাবে কার্য্য করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হন। মহামনস্বী সক্রেটিসের মহৎ উপদেশ—"মানব আপনাকে অবগত হও।" এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার উপায়ই ইতিহাস পাঠ।

নীতিবিজ্ঞান (Ethics) ও সমাজ-শাসন-বিজ্ঞানের (Politics) মূলভিত্তি স্বরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন মনুষ্যমণ্ডলী, কি প্রকার নীতিবিজ্ঞান ও সমাজ-শাসন-বিজ্ঞানের মতানুসারে দলবদ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ জাতিতে পরিণত হইতেছে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ইতিহাসে পাঠ করা যায়। কোন চিন্তাশীল লেখক কহিয়াছেন যে, আমরা ইতিবৃত্তের আলোচনা না করিলে, গভীর অন্ধকার-কূপে নিপতিত হইতাম।

দেখা যাইতেছে, আমরা ইতিবৃত্তের আলোচনায় অনেক সার উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হই। আবার কখন কখন উহা পাঠে বিমল আনন্দও উপভোগ করা যায়। এমন কি সময়ে সময়ে কোন বিশেষ বিশেষ ঘটনা আমাদিগের কল্পনাশক্তিকে এত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করে ও এরূপ কৌতুহল উদ্দীপন করায় যে, যেন আমরা কোন চিত্তহারক উপন্যাস পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাস, মনুষ্যকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয় এবং একের দুঃখে অপরকে দুঃখিত ও উন্নত জাতির অবনতিতে মনুষ্যের মনোমধ্যে দুঃখ-ভাবের উদ্রেক করায়।

এক সময়ে মুসলমানগণ উন্নতির কি উচ্চতম চূড়ায় না আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুরীতি নীতি, বিদ্যাচর্চ্চা ও বিজ্ঞান-আলোচনা সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন জগতের অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থানে তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কোন কোন চিন্তাশীল লেখক, মধ্যবর্ত্তী সময়কে (Middle ages) মুসলমানদিগের কাল বলিয়া অভিহিত করেন। আরবীয় মুসলমানেরা ভৈষজ্য ও রসায়ন বিদ্যা, কাগজ, বারুদ ইত্যাদি য়ুরোপখণ্ডে প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মোপাসকগণের ধর্ম্মস্থান পালেষ্টাইনের জন্য মুসলমানগণ একক, সম-

বেত সমগ্র য়ুরোপবাসী ও অন্যান্য খ্রীষ্টান অধিবাসীগণের সহিত বহু-কাল যাবত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন চিন্তাশীল য়ুরোপীয় বিচক্ষণ লেখক, সেই সমবেত য়ুরোপীয় ও মুসলমানগণের রীতি নীতি, আচার ও যুদ্ধ-প্রণালীর তারতম্য করিয়া, য়ুরোপীয়গণের অসভ্যতা ও মুসলমানগণের সকল বিষয়ে উৎকৃষ্টতা অবলোকনে আক্ষেপ করিয়াছেন। এই সকলের আলোচনায় দেখা যায় যে, মুসলমানগণের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী কিরূপ সদয় হইয়াছিলেন।

য়ুরোপখণ্ডে আরবীয় মুসলমানদিগের রাজ্যবিস্তার নিবন্ধন কি মঙ্গলজনক ফল প্রসূত হইয়াছিল, পাঠকের সুগোচরার্থে ইতিহাস-লেখক প্রেস্কট সাহেবের মন্তব্য নিম্নে প্রকটিত করিলাম। "য়ুরোপখণ্ডে স্পেনীয় আরবদিগের প্রাবল্য-চিহ্ন, তাঁহাদের দত্ত শিক্ষা ও জ্ঞানে যত না দৃশ্যমান হয়, তাঁহারা য়ুরোপের বহুকাল যাবত জীবনী-শক্তিহীন উদ্যমের মধ্যে যে নব শক্তি সঞ্চালন করেন, তাহাতেই বিশেষরূপে জাজ্বল্যমান দেখা যায়। প্রাচীন জগতের সহিত আধুনিক জগতকে যে সময় বিভিন্ন করিয়া দেয়, সেই ঘন ঘোর রজনীর সঙ্গে সঙ্গেই আরবদিগের অভ্যুত্থান হইতে আরম্ভ হয়। দীর্ঘকালব্যাপক অবিশ্রান্ত কর্ষণসূত্রে ক্ষেত্র উর্ব্বরাশক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। আরবগণ প্রবল বন্যার ন্যায় আসিয়া প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন উৎপাটিত করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে উর্ব্বরাশক্তি আনয়ন করে, তাহাতে বন্যার জল সরিয়া যাইবার পরই চতুর্দ্দিক নবজীবন প্রাপ্ত ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়।"* আরবীয় মুসলমানগণের অবনতিতে ইতিহাস-লেখক প্রেস্কট সাহেব যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে পত্রস্থ করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন,

---

* The influence of the Spanish Arabs, however, is discernible not so much in the amount of knowledge as in the impulse which they communicated to the long-dormant energies of Europe. Their invasion was coeval with the commencement of that night of darkness which divides the modern from the ancient world. The soil had been long impoverished by long assi-

উহা কিরূপ হৃদয়ভেদী ও সকরুণভাবে পরিপূর্ণ। "যে সাম্রাজ্য এক সময়ে প্রাচীন জগতের অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া ছিল, এখন তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া, পূর্ব্বতন সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে এবং বেডুইনগণ তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের পূর্ব্বের মত স্বাধীন ভাবে অসভ্যের ন্যায় স্বদেশের মরুভূমিতে ভ্রমণ করে। যে ভাষা এক সময়ে ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ উপকূল ও ভারত মহাসাগরের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহা এখন নানা প্রকার বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। আফ্রিকার যে স্থান সমূহ জ্ঞান ও শিক্ষার জ্যোতিতে এক সময়ে প্রভান্বিত হইয়াছিল, আবার এখন সেই সেই স্থল গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এমন কি ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের জন্মভূমিতেও কোরাণের সুন্দর ভাষা প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার ন্যায় পঠিত হইয়া থাকে। সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটী মাত্রও মুদ্রাযন্ত্র লক্ষিত হয় না। হায়! স্পেন রাজ্যের—খৃষ্টান স্পেন রাজ্যেরও পূর্ব্বের তুলনায় কম অবনতি হয় নাই। তাহার পূর্ব্বতন জ্ঞানচর্চ্চার পরিবর্ত্তে মৃত্যুবৎ আলস্য আসিয়াছে। সারাসেনদিগের রাজত্ব সময়ে যে সমস্ত নগরী জীব-পরিপূর্ণ ছিল, এখন তাহা জনশূন্য হইয়াছে। স্পেনের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা পূর্ব্বের মতই সুন্দর, কিন্তু উহার ক্ষেত্র ও কাননগুলি পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রচুর শস্য ও নানা ফল ফুলে সুশোভিত হয় না। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি আরবদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত এবং পর্য্যটকগণ সেই সকল জনশূন্য রমণীয় ধ্বংসাবশেষ মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, তাঁহাদের রচিত পরীর গল্প যেমন ইন্দ্রজাল ও কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়, সেই মত সেই আরবদিগের অস্তিত্ব এবং সেই জাতির ভাগ্য সম্বন্ধে স্থির চিত্তে চিন্তা করেন।*

---

duous cultivation. The Arabians came like a torrent, sweeping down and obliterating even the landmarks of former civilization, but bringing nevertheless a fertilizing principle, which, as the waters receded, gave new life and loveliness to the landscape. (Prescott's History of the Reign of Ferdinand and Isabella. New and Revised Edition of John Foster Kirk p. 198.]

* The empire, which once embraced more than half of the

বিচক্ষণ মনীষীগণ যথার্থই কহিয়াছেন, ইতিহাস পাঠে মনুষ্যবৃন্দ সার্ব্বভৌমিক প্রেমে আকৃষ্ট হয়। ইতিহাস পাঠে সৌভাগ্যলক্ষ্মী কাহারও প্রতি চিরকাল সমান দয়া প্রকাশ করেন না, ইহা জানিতে পারা যায় ও সেই সঙ্গেসঙ্গে মনুষ্যবৃন্দকে সহিষ্ণুতা (toleration) শিক্ষা প্রদান করে।

মনুষ্যবৃন্দের উন্নতি এরূপ আশ্চর্য্য ও অজ্ঞাতভাবে সম্পন্ন হইতেছে যে, উহা রোধ করা অসম্ভব। সুবিখ্যাত নরপতি কেনিউট যেরূপ তাঁহার তোষামোদকারীগণকে সমুদ্রের স্ফীতি রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য, এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠেও বোধ হয় যে, মনুষ্যের উন্নতি রোধ করা সেইরূপ অসম্ভব। প্রভূত ক্ষমতাশালী নরপতিগণ, জনসাধারণের উন্নতি অবরোধ করিতে যাইয়া, সমগ্র জগতের অশেষ কলঙ্কভাজন

---

ancient World, has now shrunk within its original limits ; and the Bedouin wanders over his native desert as free, and almost as uncivilized, as before the coming of his apostle. The language which was once spoken along the southern shores of the Mediterranean and the whole extent of the Indian Ocean is broken up into a variety of distinct dialects. Darkness has again settled over those regions of Africa which were illumined by the light of learning. The elegant dialect of the Koran is studied as a dead language even in the birthplace of the Prophet. Not a printing-press at this day is to be found throughout the whole Arabian Peninsula. Even in Spain, in Christian Spain, alas! the contrast is scarcely less degrading. A death-like torpor has succeeded to her former intellectual activity. Her cities are emptied of the population with which they teemed in the days of the Saracens. Her climate is as fair, but her fields no longer bloom with the same rich and variegated husbandry. Her most interesting monuments are those constructed by the Arabs; and the traveller, as he wanders amid their desolate but beautiful ruins, ponders on the destinies of a people whose very existence seems now to have been almost as fanciful as the magical creations in one of their own fairy-tales. [Prescott's F and I. p. 201.]

হইয়াছেন। তাঁহাদের নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে জগতের কিছুই অমঙ্গল সাধিত হয় নাই ; কেবল মাত্র সেই সময়ের ব্যক্তি বিশেষের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সেই সকল নরপিশাচ তাহাদের কার্য্য হেতু জগতের নিন্দনীয় হইয়া রহিয়াছে।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা অনন্ত কালের সহিত মিলিত হই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর অবস্থিতি বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা হইতেও অনন্ত কালের ধারণা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কেবল মাত্র ইতিহাস হইতেই আমরা অতীত কালে মানবগণের আচার ব্যবহার ও সংস্কার কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারি। অতএব ইতিহাস মানবজীবনের মানচিত্র (Chart) ও দিক্‌দর্শন (Compass) স্বরূপ।

বর্ত্তমান কালে মনুষ্যের বহু শতাব্দী যাবত পরিশ্রমের ফল ও অভিজ্ঞতা জগত মধ্যে প্রচারিত থাকিলেও মানবজীবনের জটিল প্রশ্ন সমুদয় ও মনুষ্য-সমাজের অশেষবিধ কূট তর্কগুলির সন্তোষরূপে মীমাংসা হয় নাই। মনুষ্যবৃন্দের সকল প্রকার স্বত্ব ও দায়িত্ব সুচারুরূপে সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে কি না, ইহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এক মাত্র ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিদান করিলে, মনুষ্যসমাজে কি বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, মনুষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া কি প্রকার প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল ও রাজ্যশাসন-প্রণালী কিরূপ জটিল কূট প্রশ্নের সহিত মিশ্রিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জনসাধারণের শিক্ষার অভাব সূত্রে কুসংস্কার নিবন্ধন কি বিষময় ফল প্রসূত হয়, তাহার উদাহরণও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে লক্ষিত হয়। মনুষ্যের অশ্রুবারি ও শোণিতে উহা লিপ্ত থাকিলেও রাষ্ট্রবিপ্লব মনুষ্যবৃন্দের মহা উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনা। এত অল্পকালের মধ্যে এত অধিক নানাবিধ বিয়োগান্ত ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি জগত মধ্যে আর দৃশ্যমান হয় নাই। আবার আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলির ফলাফল এত সত্বর লক্ষিত হইয়াছিল যে, জগত মধ্যে সেরূপ দৃশ্য আর কখনও মনুষ্য চক্ষে নিপতিত হয় নাই। মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে ভ্রান্তিকূপে পতন এবং সেইসূত্রে দোষাবহ অনুষ্ঠান এবং তন্নি-

বন্ধন মনুষ্যের দণ্ডভোগ, এই সমুদয় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা গুলির চিত্র ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিদান করিলে, আমাদের নেত্রপথ আকর্ষণ করে। প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়মধ্যে ভগবান যে হিতাহিত বুদ্ধিবীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন ও যাহা হইতে আমরা সর্ব্ববিষয়ে শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, সেই মূল হিতাহিত বুদ্ধিশক্তিটী রাষ্ট্রবিপ্লব কালে ফরাসী জাতির মস্তিষ্ক এত আলোড়িত করিয়া তুলে এবং সেই সূত্রে ফরাসী জাতি আগ্রহের সহিত তৎকালে এরূপ নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে থাকে যে, তদ্দৃষ্টে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ অমানুষিক বলিয়া উপলব্ধি হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সভ্যজগতে যে মহান্ মতবাদ-গুলি বিশেষ প্রকারে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই মতবাদের কতকগুলি গ্রহণ করিয়া, এস্থলে পাঠকদিগকে নিবেদিত হইল। ১ম—পাশবিক বলের উপর ন্যায়ের প্রভুত্ব। ২য়—কুসংস্কারের উপর জ্ঞানের আধিপত্য। ৩য়—শাসনশক্তির উপর প্রজাবৃন্দের প্রাবল্য। ৪র্থ—মানবস্বত্ব-বিপ্লবের ফল স্বরূপ—সাম্যবাদের প্রচলন। ৫ম—যথেচ্ছ ক্ষমতার স্থলে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, রাষ্ট্রবিপ্লবরূপ মহাযজ্ঞের মহা ক্রিয়ার অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত মহাযজ্ঞের আলোচনায় মনোমধ্যে স্বতঃই কেমন একরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়, যেন মনুষ্যবৃন্দের ক্রিয়া কাণ্ডের—জীবন-লীলার মধ্যে মধ্যে এমন একটী সময়ের সূচনা ঘটে, বোধ হয় যেন সেইটী—সেই বিশেষ সময়টী অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যবর্ত্তী সময়। অতীত কালটীকে অতীতের অনন্ত গর্ভে নিক্ষেপ করিবার জন্য ও ভবিষ্যৎ কালকে নবীন নিয়ম প্রণালীতে বিভূষিত করিয়া, জগত মধ্যে প্রচলন নিমিত্তই বিশেষ সময়টীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীন মতবাদগুলির জীর্ণতা প্রাপ্তি নিবন্ধন যেন ভগবান মধ্যবর্ত্তী কালকে প্রেরণ করেন। মনুষ্য-গঠিত সমাজ-শাসনের বিবিধ বিধিগুলি (Institutions) পুরাতন ও অকর্ম্মণ্য হইলে, মনুষ্য

বৃন্দকে নব নব বিধি এবং নৈতিক নিয়মপ্রণালী সৃষ্টি করাইবার জন্য যেন সেই বিশেষ সময়টী জগত মধ্যে দেদীপ্যমান হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলস্বরূপ য়ুরোপখণ্ডে যে নৈতিক নিয়ম প্রণালী ও বিধিগুলি লইয়া, যে মহা ঘোরতর আন্দোলন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল পণ্ডিত এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন যে, উক্ত মূল নীতি গুলি মহান্ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ ও উহাতে ঐশ্বরিক (Divine) ও বিশ্বজনীন সদয় ভাব (Humanity) নিহিত।

ইতিবৃত্ত পাঠে কি মহা শুভ ফল প্রসূত হয়, তাহার আলোচনা বড় সহজ ও লঘু নহে। এ অবধি যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে কেবল সাধারণ স্থূল কথার উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। কাহার দ্বারা কি প্রণালীতে রচিত ইতিবৃত্ত পাঠে উপকার লাভ করা যায় ও সেই সূত্রে অধিক পরিমাণে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, সেই অতি আবশ্যকীয় বিষয় লইয়া, কোন কথার উত্থাপনা হয় নাই। মনুষ্যের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে ও প্রকৃত রূপে ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে পারিলে, সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়। এমন কি কোন বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি ও যে বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতবাদ বিভিন্ন ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলি লইয়া আমরা আলোচনা করিলে, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কেন, কি নিমিত্ত ঘটনাগুলির অভ্যুত্থান, তিরোধান ঘটিয়াছে, তাহা সমালোচনা করিলে, অনেক মহা ফল ও উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতের সমগ্র জাতির ইতিবৃত্ত রীতিমত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিতে পারেন, এমন ব্যক্তি বিরল। কোন পণ্ডিত এরূপ মতবাদও প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের কার্য্য ও ঘটনাগুলির চর্চ্চা ও আলোচনা রাখিতে পারিলে, অনেক শিক্ষা ও আশু উপকার লাভ হয়। কেবল মাত্র শিক্ষিত ও জ্ঞানবান হইতে পারিলেই প্রকৃত ইতিবেত্তা হইতে পারেন না, অন্য পক্ষে কেবল নৈতিক চরিত্র পবিত্র হইলেই এ বিষয়ের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন না। এ বিষয়ে কোন চিন্তাশীল বিবেচক লেখক বলিয়াছেন, ধীরপ্রকৃতি প্রশান্তচিত্ত শিক্ষিত জ্ঞানবান ব্যক্তি ও যিনি অভাব কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে-

ছেন না ও যাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিমিত এবং যাঁহার উচ্চাশা অনুত্তেজিত অবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত নিরপেক্ষ ইতিবেত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্বদেশের ইতিবৃত্ত পাঠের উপকারিতা বিষয়ে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া, প্রস্তাবের উপসংহার করিতে মানস করিয়াছি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর সাহেব কহিয়াছেন, "স্বজাতির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সাহিত্য ও ইতিহাসের ঘটনাগুলিতে কোন গৌরব অনুভব না করিলে, জাতীয় জীবনের প্রধান অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে হয়। জার্ম্মাণগণ তাহাদের রাজনৈতিক ঘোরতর অবনতির সময়ে কেবল এক মাত্র তাহাদিগের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ভবিষ্যৎ আশা সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতেও সেই মত লক্ষিত হইতেছে।" বঙ্গের সুবিখ্যাত বাগ্মী পুরুষপ্রবর বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারত ইতিহাস পাঠ নামক বক্তৃতায় তাঁহার নিজ ভাষায় জলন্ত রূপে যে কথা গুলি উচ্চারণ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সার মর্ম্ম অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি যথার্থই কহিয়াছেন, নেত্র উন্মিলীত করিয়া যাহারা দেখিতে সমর্থ, অবশ্যই তাহাদিগের সকলেরই স্মৃতিপথে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি স্বতঃই জাগরুক হইতে পারে যে, পুরাকালে কাব্যলেখক, নবন্যাস-লেখক, স্মার্ত্ত, গণিৎবেত্তা, দার্শনিক, এমন কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবেত্তা অর্থাৎ সকল প্রকার শাস্ত্রকারেরাই প্রাচীন ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই প্রগাঢ় পণ্ডিত বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মনীষীগণের নিকট প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও জ্ঞানগুলি আদরের সামগ্রী হইয়াছে; ইংরাজ-শাসন সূত্রে শিক্ষিত ভারতবাসী, য়ুরোপীয় মনীষীদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি অবশ্য পাঠ করিতেছেন। কিন্তু রামায়ণ এবং মহাভারতের ন্যায় মহান নৈতিক উপদেশপূর্ণ মহাকাব্য আর কোন ভাষায় পাঠ করেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ বিখ্যাত বাগ্মী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কহেন, রাজা রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পবিত্র ও সাধুচরিত লোক আর

কোথাও দৃষ্ট হয় না। অঙ্গীকার প্রতিপালন, মনুষ্যের অতি পবিত্র কর্ত্তব্য পিতা মাতার প্রতি জীবন্ত ভক্তি, অতিথির সেবা, সত্যবাদিতা, গুরুজনের আজ্ঞা পালনে জীবন উৎসর্গ, এই গুলি রামায়ণ ও মহাভারতে অতি মনোমুগ্ধকর কমনীয় অথচ সরল ভাষায় এরূপ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত আছে যে, উক্ত মহাকাব্য পাঠে কাহার না হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে?

থরণ্টন সাহেবের ব্রিটিস ভারত নামধেয় পুস্তকে যাহা উল্লেখ আছে, এস্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ সার মর্ম্ম গৃহীত হইল। তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন, "ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুজাতি সকল জাতি অপেক্ষা অতি প্রাচীন ও সর্ব্বাগ্রে সভ্যতা-শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। যে সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎপাঠে এই ধারণা জন্মে যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও বিধিগুলি সভ্যতার সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কেবল মাত্র ব্যবহার্য্য শিল্পাদির চর্চ্চা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল এমত নহে, অথবা কেবল মাত্র বিলাস-ভোগ্য দ্রব্যাদির প্রচলন হইয়াছিল তাহাও নহে, অথবা দ্রব্যাদি মাধুর্য্য ও সুঠামের পরিচয় দিয়াছিল, কেবল মাত্র ইহাও লক্ষিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দুগণ অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও ইন্দ্রিয়-সুখে বিরত থাকিয়া, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জনপদসমূহ অধিবাসীবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। * * * ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার চূড়ান্ত পরিচায়ক কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি শত সহস্র বৎসরের কঠোর বিপ্লবেও বিলুপ্ত না হইয়া, তৎসমুদয়ের সারত্বের পরিচয় দিতেছে।"

উপসংহারে আমাদিগের এই মাত্র ব্যক্তব্য যে, ইতিবৃত্ত পাঠের ফলস্বরূপ বঙ্গবাসীগণ সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতরূপ তারতম্য ও বিশ্লেষণে আদর প্রকাশ করিতে এবং কল্পনাশক্তিকে দমনে রাখিয়া, সত্যের অধিকতর সম্মান করিতে শিখিবেন। আজি কালি চারিদিকেই হিন্দুদিগের ন্যায়

সভ্য ও শিক্ষিত জাতি আর নাই, ইহার প্রতিধ্বনি ছুটিতেছে। যদিও প্রাচীন হিন্দুগণ সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, অনবরত সেই দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবেক না। মহাকবি মিল্টন যথার্থই কহিয়াছেন, মনুষ্য যে শিক্ষা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎপ্রতি কেবল তাকাইয়া থাকিলে চলিবেক না, তৎপরবর্ত্তী জ্ঞানালোক লাভে যেন যত্নবান্ থাকেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আর্য্যগণ মূলতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে আর্য্য হিন্দুগণ স্বকীয় শিক্ষা এবং সংস্কার অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় এখন হিন্দুজাতি মধ্যে বিরাজিত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ভারতের শেষ সৃষ্ট নব ধর্ম্মসম্প্রদায়। বর্ত্তমান এবং ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুদ্ধ বঙ্গদেশ কেন ?—সমগ্র ভরতবর্ষের প্রতি প্রান্তেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতির প্রবল প্রাদুর্ভাব এবং দৃঢ় আধিপত্য হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানে এরূপ ধারণা হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর আচার ব্যবহার এবং কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মনীতির অনেক অনুষ্ঠানের আভা প্রতক্ষ্য বা অপ্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান। আর্য্য হিন্দু-মহিলা, শিবপূজাও করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেকগুলি আচার সংস্কার এবং কার্য্যপ্রণালী বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মনীতিরূপ সুগন্ধ সুপবিত্র ফুল্লফুল ভারতের প্রতি প্রান্তে হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়কেই স্বর্গীয় সৌরভে বিমোহিত এবং ভারতকে আমোদিত করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ হিন্দুর গৃহ নাই, যথা হইতে কেহ না কেহ পবিত্র পুণ্যতীর্থ মহাক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে অথবা শ্রীবৃন্দাবনধামে ভগবানকে সন্দর্শন করেন নাই। জগন্নাথ মহাক্ষেত্র সম্বন্ধে কপিল সংহিতাতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, মহাক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের সন্দর্শনে মনুষ্য, সকল পাপ হইতেই মুক্তি লাভ করে। জগন্নাথ মহাক্ষেত্র দেবগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। কোন প্রাচীন আর্য্য ঋষি এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যদিগের বাসভূমি

ভারতক্ষেত্রই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জগন্নাথ মহাক্ষেত্র সকল তীর্থের শীর্ষস্থানীয়।

খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবদিগের মতবাদ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উইলসন সাহেব অনুমান করেন, ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হয়। প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইতে চলিল বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে অলক্ষ্যে বেদের আভা দেদীপ্যমান। এখানি অষ্টাদশ পুরাণের এক অঙ্গস্বরূপ।

দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম-তরঙ্গের অভিঘাত দৃশ্যমান হয়। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক রামানুজ, দেশদেশান্তরে নিগৃহীত এবং বিতাড়িত হইয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। ভগবান বিষ্ণুই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনিই আদি কারণ এবং সমগ্র চরাচরের স্রষ্টা এই মূল সূত্রটী ঘোষণা করেন। রামানুজ আরও কহেন, "ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, হরি-পদবাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্যামী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি গুণাস্পদতারূপ স্বভাবশালী। চিৎ অচিৎ সমুদয় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরমকারুণিক এবং ভক্তবৎসল। উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশতঃ পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদি অবতার স্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনুরুদ্ধ, এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম, ও সংপূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তরের উপাসনাতে অধিকার জন্মে। উপাসনা পাঁচ প্রকার—দেব মন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে। এবং গন্ধ পুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান কহে। পূজাকে ইজ্যা কহে। অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ নাম সংকীর্ত্তন ও তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় কহে। এবং দেবতা

অনুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনা কর্ম্মদ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে, করুণাসিন্ধু ভগবান স্বকীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। নিত্যপদ প্রাপ্তি হইলে ভগবানকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারা যায়, এবং পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না।" তিনি আরও কহেন, যে প্রকার আমাদিগের ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব, সেই প্রকার জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীবাত্মা ঈশ্বরের শরীর বলিয়া অভিহিত হয়েন। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রাকৃতগণের ন্যায় রাগ, দ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই, এইজন্য ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন পদার্থ নাই। এই সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত ধর্ম্মমতবাদগুলি অচিরে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতি সমগ্র ভারতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতি সর্ব্বপ্রথমে জাতিসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবের উদ্দীপনা উপস্থিত, মানব মধ্যে অভেদভাব বিস্তার, এবং স্বাধীনমতবাদ প্রচারের সূত্রপাত করিয়া দেয়। যাহা হউক, যে তরঙ্গ প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ বিলোড়িত হয়, যে তরঙ্গ হিন্দুজাতির মনক্ষেত্রকে সিক্ত করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্মনীতিবীজ বপন করিতে সক্ষম হয়, সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতির প্রচার—সেই জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা এবং আন্দোলনের আভাষ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে দেখা দেয়।

বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হইবার পরবর্ত্তী সময় হইতে একের পর এক অনেকগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক সমুত্থিত হইতে থাকেন। মহাত্মা রামানুজের তিরোধানের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতে মহা ধর্ম্মসংস্কারের সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার সূত্রে দক্ষিণ ভারতের অনেকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে ধর্ম্মবীর রামানন্দই প্রথম আদিষ্ট বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক, কেহ কেহ এরূপ কহিয়া থাকেন।

ইনি ধর্ম্মপ্রচারক রামানুজের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন কি না, অথবা ইনি চতুর্থ কি পঞ্চম ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, সে কথা লইয়া এস্থলে বৃথা তর্ক তুলিবার কোন বিশেষ আবশ্যক নাই।

যে সময়ে য়ুরোপখণ্ডে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়গণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মের উদ্দীপনাবীজ বপিত হইতে আরম্ভ হয়, মহাত্মা রামানন্দ ঠিক সেই সময়েই উত্তর ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি এই ধর্ম্ম প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়া, ভয়সঙ্কুল শ্বাপদবেষ্টিত পথ অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন নগরীতে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। এই সূত্রে তাঁহাকে যে, অশেষ ক্লেশ সম্ভোগ করিতে হয়, তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি যেখানেই গমন করিতে থাকেন, সেই স্থানের লোকেরাই তাঁহার ধর্ম্মমত শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে থাকেন। রামানন্দ এইরূপে উত্তর ভারতের নানাস্থানের অধিবাসীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে দ্বাদশটী পাত্রকে স্বীয় শিষ্য-পদে বরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সেই দ্বাদশটী শিষ্যের মধ্যে একটী ধর্ম্মব্যবসায়ী, অপর একটী ক্ষৌরকার এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শিষ্যটী তন্ত্রবায় জাতীয় ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন শারীরিক সুখকর নহে—উহা অশেষ প্রকার ক্লেশকর। সংসারের যাবতীয় স্নেহ-মমতা-বন্ধনী একেবারে ছিন্ন করিয়া, সংসারী মানবের উপভোগ্য সমস্ত সুখে একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া, আত্মীয়-প্রিয়-পরিজনগণের মায়াজাল ছেদন করিয়া, সেই দ্বাদশটী শিষ্য, বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচাররূপ ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গল, শান্তি, পবিত্রতা, পুণ্য এবং অন্তিমে মুক্তিলাভের সহায়তা করিতে বহির্গত হয়েন। কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়া নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রচাররূপ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে থাকেন। এক মাত্র ভিক্ষাই সেই ভিক্ষুকবেশী পরিব্রাজক ধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবন ধারণের উপায় ছিল। মহাত্মা রামানন্দ, কেবল উত্তর ভারতবর্ষ নহে, অন্যান্য স্থানেও বৈষ্ণব

ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, বৃদ্ধাবস্থায় মঠাশ্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক রামানন্দ সর্ব্বাদৌ এই মহান্ মূল ধর্ম্ম-নীতিসূত্র প্রচারিত করেন যে, এ জগতের সকল জীবই ভগবান্ হরির সমান দয়ার পাত্র, সকলেরই প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এবিষয়ের উল্লেখও আছে। দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মপ্রচারক রামানুজ, দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন যে, ভগবান্ বিষ্ণুই সকলের আদি কারণ। রামানন্দ সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবমণ্ডলী মধ্যে সাম্যবাদ প্রচার করেন, অর্থাৎ ভগবান্, সকল জীবের প্রতিই সমনেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, এই মতবাদ বদ্ধমূল করিয়া দেন। জীবের নানাবিধ ক্রিয়া কাণ্ড, ধর্ম্ম এবং নৈতিক নিয়মের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, এসম্বন্ধে রামানন্দ বহুবিধ প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা প্রণয়ন পূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতবর্ষের এই প্রবল ধর্ম্ম নীতির আন্দোলন এবং বিপ্লব-তরঙ্গ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বঙ্গদেশে এই ধর্ম্ম-নীতির লীলা চূড়ান্ত রূপে হয়। মহাত্মা রামানন্দের সুবিখ্যাত তন্তুবায় শিষ্য কবীরপন্থ বঙ্গদেশে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবীর কবীর কেবল বঙ্গদেশ নহে, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-পতাকা সমুড্ডীন করিয়া দেন।

ধর্ম্মপ্রচারক কবীরপন্থ এবং তৎসম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সে সময়ে ভারতে কেবল একমাত্র হিন্দু অধিবাসী ছিল না। তখন মুসলমানেরাও ভারতের অধিবাসী হইয়াছিলেন। কবীরের ধর্ম্মপ্রচারের সবিশেষ বিবরণ পাঠে পূর্ব্বেই জানা যায় যে, তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিকেই সম্বোধন করিয়া উভয় জাতির মধ্যেই স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকগণ

কেবল মাত্র হিন্দু জাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কবীর, মুসলমান জাতির মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করায় সহজেই এমত অনুমিত হইতে পারে যে, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ বোধ হয় ভিন্নপ্রকার ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কবীর এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচারকগণ সকলেই বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন, এবং সকলেই বিষ্ণুকে একমাত্র আদি কারণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রচারকগণ সকলেই পরস্পরের সাক্ষাৎ বা গৌণ শিষ্য ছিলেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে অবশ্য এমত হইতে পারে যে, ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের ব্যাখ্যা এবং প্রচার, একের অপেক্ষা অপরের রীতিমত প্রণালীতে হইয়াছিল—একের অপেক্ষা অপরের প্রচার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু মূলতঃ তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম-সেবক এবং প্রচারক।

এস্থলে মহাত্মা কবীরের কতকগুলি ধর্ম্ম এবং নৈতিক মতবাদ উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, এগুলি কিরূপ উচ্চ অঙ্গের এবং কিরূপ গভীর চিন্তাপ্রসূত ;—

"(১) হিন্দুরা যাঁহাকে শ্রীরাম এবং মুসলমানেরা যাঁহাকে আলি বলিয়া পূজা করেন, তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী বিভু। সেই ভগবান শ্রীরাম এবং আলি কর্ত্তৃক আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, অতএব আমরা পরস্পরে (হিন্দু মুসলমানে) পরস্পরকে স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিব।

(২) যদি আমাদিগের অন্তঃকরণ কুটীলতায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানেও কিছু হয় না, মন্দির মধ্যে দেবদর্শনেও কিছু হয় না, মুখপ্রক্ষালনে বা মালা জপিলেও কিছু হয় না, অথবা মন্ত্র উচ্চা-রণে ও তীর্থ পর্য্যটনেও কিছু হয় না।

(৩) হিন্দুরা প্রতি একাদশীতে উপবাস করেন এবং মুসলমানেরা রমজানের সময় উপবাস করেন, কিন্তু অপরাপর দিবস কাহাকে লইয়া হয়? তুমি একদিবস মাত্র ভগবানকে পূজা করিবে বা তাঁহার জন্য উপবাস করিবে?

(৪) যদি সৃষ্টিকর্ত্তা, মনুষ্য-নির্ম্মিত উপাসনাস্থানেই কেবল মাত্র অবস্থান করেন, তাহা হইলে এই সমগ্র জগতকে কে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন?

(৫) হিন্দুদিগের ঈশ্বর পূর্ব্বদিকে, এবং মুসলমানদিগের ঈশ্বর পশ্চিমদিকে, কিন্তু আপন অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর, দেখিবে, অন্তর্যামী বিভু তথায় বিরাজিত। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী; যিনি এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আলি ও শ্রীরাম-পূজকগণের পিতাস্বরূপ, তিনি আমার চালক এবং গুরু।”

ধর্ম্মপ্রচারক কবীরের নৈতিক নিয়ম সমুদয় ধর্ম্মমতবাদের ন্যায় মহান্ ভাবের উপর নিহিত। উহা অতি সুন্দর প্রণালীতে ব্যাখ্যা হইয়াছে। সর্ব্বজীবে অহিংসা, সত্যের প্রতি সম্মান, ধর্ম্ম গুরুর প্রতি ভক্তি-কথায় উক্ত নৈতিক নিয়মগুলি পরিপূর্ণ।

অহিংসাভাব সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—জগতের যাবতীয় জীবই ভগবান কর্ত্তৃক জীবন লাভ করিয়াছে, সুতরাং জীবহত্যা মহাপাপ। সত্য সম্বন্ধে—জগতের যাবতীয় অনিষ্ট বা অমঙ্গল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানাভাব এক মাত্র আদিম মিথ্যাজ্ঞান হইতে সম্ভূত। বৈরাগ্য ভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে—এ সংসারে ইন্দ্রিয় এবং মন বিচলিত হইলেই মনুষ্যের শান্তি লাভ এবং ভগবচ্চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে। ধর্ম্মগুরু সম্বন্ধে—শিষ্য কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিতে অভিলাষী হইলে, সর্ব্বাগ্রে সেই গুরুর ধর্ম্মবিষয়ক মতবাদ ও চরিত্র বিশেষরূপে অবগত হইয়া, পরে আপন আত্মাকে সেই গুরুর হস্তে সমর্পন করেন। গুরু সকল বিষয়ে অন্ধ হইলে শিষ্যের কি দশা ঘটিবে? কারণ অন্ধ, অন্ধকে পথ দেখাইতে যাইলে, উভয়েরই কূপমধ্যে পতন অনিবার্য্য।

মহাত্মা কবীরের ধর্ম্ম এবং নৈতিক মতবাদের প্রবল আন্দোলনে বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম জাতিসাধারণকে বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। কবীরের ধর্ম্মগুরু রামানন্দ, এই মতবাদ প্রচার করেন যে, সকল সম্প্রদায়ই ভগবানের নিকট সমান দয়ার পাত্র। কবীরের

মতবাদে প্রকাশ যে, যে কোন ধর্ম্ম-সেবকের মধ্যেই ভগবান্ বিরাজিত। কারণ ভগবান্ বিষ্ণু সকল সম্প্রদায় মধ্যেই বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মীন, বরাহ, এবং কূর্ম্ম প্রভৃতি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। কবীর আরও কহেন যে, "হৃদয় মধ্যে যথায় সত্য বিরাজমান, তথায় আমি (বিষ্ণু) অবস্থান করি।"

মহাত্মা কবীরের ধর্ম্ম ও নৈতিক মতবাদ, অতি উচ্চ, মহান এবং গভীর ভাবের উপর নিহিত। তিনি যে সর্ব্বজীবে সমভাব প্রদর্শন, সকল জীবের প্রতি জগদীশ্বরের সমদৃষ্টি নিপতিত এবং সর্ব্বজীবের মধ্যে অভেদ ভাব, এই মহোচ্চ গভীর মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে মনুষ্য-হৃদয়কে যেমন পবিত্র মহোচ্চভাবে উত্তোলিত করা হইয়াছে, সেই মত সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের মহত্ব হ্রাস না করিয়া, বরং সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতই করা হইয়াছে।

কি সম্ভ্রান্ত ধনী, কি মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থ এবং কি দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয় সকল শ্রেণীর সর্ব্বসাধারণেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। জনসাধারণে তাঁহাকে এত অধিক ভক্তি করিত যে, কবীর তন্ত্রবায়জাতীয় ছিলেন বলিয়া, নীচ সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ গৌরব অনুভব করিত। অন্য পক্ষে মুসলমানেরা কবীরকে মুসলমানজাতীয় বলিয়া প্রকাশ করিতেন। অপর পক্ষে কবীর অলৌকিকরূপে বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমত কহিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, একদা কোন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা স্বীয় পিতার সহিত মহাত্মা রামানন্দকে দেখিবার নিমিত্ত তৎসন্নিকটে গমন করেন। তৎকালে রামানন্দ ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রকৃত অবস্থা অবলোকন না করিয়াই উক্ত বিধবাকে "একটী পুত্র সন্তান লাভ কর।" বলিয়া বর দান করেন। এরূপ জনপ্রবাদ যে, উক্ত বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা যথা সময়ে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। প্রসবের পর উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যা লজ্জায়, ঘৃণায়, এবং অপমানে প্রাণত্যাগ করেন। কবীর

সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভজাত সন্তান। কোন এক তন্তুবায়, পত্নীর সহিত কবীরকে আপনাদিগের সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করেন।

কবীরের জন্মের ন্যায় মরণ সম্বন্ধেও একটী বিচিত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে। কবীর প্রাণ ত্যাগ করিলে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার মৃতদেহ লইয়া কলহ উপস্থিত করে। হিন্দুরা যেমন কবীরের শব সৎকার করিতে অভিলাষী হয়েন, অন্যপক্ষে মুসলমানেরাও সেইমত তাঁহার শব সমাধিস্থ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার বাদানুবাদ আরম্ভ হইলে, সহসা কবীর তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন। বর্ণিত আছে যে, কবীর উক্ত বিবাদমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য উপস্থিত হিন্দু ও মুসলমানদিগকে আদেশ করেন; সকলে উক্ত অনুজ্ঞামত বস্ত্র উন্মোচিত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল যে, শবের পরিবর্ত্তে স্তূপাকার পুষ্প এবং তুলশী রহিয়াছে মাত্র। এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল এবং অবশেষে হিন্দু ও মুসলমানগণ সেই পুষ্পরাশি বিভাগ করিয়া, স্ব স্ব জাতীয় প্রথামত সৎকার এবং সমাধিস্থ করিল।

কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, মহাত্মা কবীর ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে ব্রতী ছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার-তরঙ্গ বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার চিহ্নস্বরূপ অদ্যাবধি উড়িষ্যায় কবীরের নামে উৎসর্গীকৃত মঠ বিরাজিত। পুণ্যভূমি শ্রীক্ষেত্রধামে গমনকারী প্রত্যেক তীর্থযাত্রীই অদ্যাবধি সেই মঠমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ভক্তি সহকারে বারি এবং তণ্ডুল প্রদান করেন।

অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহাত্মা চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতির প্রবল তরঙ্গ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত

তথ্যের ও কারণ সমূহের বহুকাল দূরে অবস্থিতি নিবন্ধন বিষয়টীর গুরুত্ব সম্যক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজসাধ্য নহে। মনুষ্যের স্বভাবটী কিরূপ তাহা জানিতে পারিলে, এবং উহার সংস্কার কিরূপ কঠোরজনক তাহা ধারণা করিতে পারিলে, বিষয়ের গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি হয়। যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, আপন চরিত্র সংশোধন করা কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তখন নিজ চরিত্র সংশোধিত এবং পবিত্র ভাবে রাখিয়া, জনসাধারণের চরিত্রকে সংশোধিত করিতে যাওয়া কিরূপ গুরুতর ইহা অনুভব করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কোন বিষয়ের দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেই তাহার গুরুত্বও সহজে বুঝা যায়। কোন এক জাতির মধ্যে ধর্ম্মসংস্কার বা ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে লিপ্ত হইতে হইলে, সেই জাতির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি কিরূপ, কাহার দ্বারা কিরূপ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, ইহা যেমন জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন, সেইমত সেই জাতির রুচি এবং শিক্ষা কিরূপ এবং সেই রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কিরূপ ধর্ম্মসংস্কারের আবশ্যক, প্রচারকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। আবার শুদ্ধ বিষয়ের অভাব বুঝিলেই হয় না, যিনি সেই অভাব পূরণ জন্য যত্নশীল হয়েন, তাঁহার প্রবল চরিত্রবলের অপেক্ষা করে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সে বিষয়ে দৃঢ় অবিচলিত গভীর বিশ্বাস প্রয়োজন।

মহাত্মা কবীরের তিরোভাবের প্রায় পঞ্চষষ্টি বৎসর পরে বঙ্গদেশে মহাত্মা চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়। বঙ্গদেশে যে, এরূপ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বঙ্গভূমির অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির এই অভ্যুদয়ের সময়ে শিক্ষিতসাধারণে মহাত্মা চৈতন্য দেবের আদর্শ জীবনী, পবিত্র চরিত্র এবং সনাতন ধর্ম্ম-মতবাদ সম্পূর্ণরূপে আলোচনা পূর্ব্বক গুণগ্রামগুলি গ্রহণ করিয়া, জাতির অভুত্থানে যত্নবান হইবেন, এমন আশা করা যাইতে পারে।

মহাত্মা চৈতন্য ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। জনপ্রবাদ যে, মহাত্মা চৈতন্য দেবের জন্মগ্রহণ কালে চতুর্দ্দিকে অলৌকিক এবং আশ্চর্য্য ঘটনা সকল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, মহাত্মা চৈতন্য দেব

মাতৃগর্ভে ত্রয়োদশ মাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সময়ে ভূমিষ্ট হয়েন, সেই সময়ে গ্রহণ সমাপ্ত হয়। মহাপুরুষগণ যে যুগে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারা সেই যুগের ফলস্বরূপ এবং সেই যুগের উদ্যমের পরিচায়ক। জনসাধারণের অভাব এবং মনস্কামনা পরিপূরণ, মনুষ্যকে অবনতি হইতে এবং পাপ হইতে উচ্চে উত্তোলন, এবং জগতে শান্তি, মঙ্গল, পবিত্রতা বিস্তার এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানব-হৃদয়ে মহান ভাবের বীজ বপন জন্যই সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণের এ জগতে যেন আগমন হয়, মহাত্মা চৈতন্য দেবের জীবনী পাঠে আমরা এ বিষয়ের সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। মনুষ্যদিগের কি অভাব এবং কি আকিঞ্চন, মহাপুরুষেরা ইহা যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান এবং তদ্রূপ ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

চৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টনিবাসী ব্রাহ্মণ। পবিত্র পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী-তীরে অবস্থান পূর্ব্বক শান্তি সংগ্রহ কামনায় তিনি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া, সপরিবারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। বিশ্বরূপ নামে ইহাঁর অপর একটী পুত্র ছিল। বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া সংসারত্যাগী হয়েন।

মহাত্মা চৈতন্য দেব বাল্যকাল হইতে শিক্ষা-জ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ প্রতিভাশক্তি প্রদর্শন করেন। কঠোর পরিশ্রমে অল্পকালেই তিনি এক জন প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং নানা শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় যশঃ পূর্ব্বেই বিকীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং অচিরে নানা স্থান হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার চতুষ্পাঠীর গৌরব লোক-মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

প্রকাশ যে, চৈতন্য দেব দুইটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠী স্থাপনের পর তিনি একবার পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। সেই সময়ে নবদ্বীপে একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

উক্ত অধ্যাপকের সহিত চৈতন্য দেব যে ভাবে শাস্ত্রালাপ করেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধার চূড়ান্ত পরিচয় দেন। বহু তর্কবাদের পর বয়স্ক অধ্যাপক সেই তরুণ চৈতন্য দেবের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করেন।

চৈতন্য দেব ২৪ বর্ষ বয়সে সংসারত্যাগী হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। তিনি সার্দ্ধ চত্বারিংশ বর্ষ কাল ধর্ম্মপ্রচাররূপ মহান্ ব্রতে লিপ্ত থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

আমরা এখন মহাপুরুষ চৈতন্যের হৃদয়ে মহান্ ভাবের উদ্দীপনার সময় উপনীত হইয়াছি। চৈতন্য দেব, শিষ্যবৃন্দবেষ্টিত হইয়া, অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে প্রবল ধর্ম্মভাব কর্ত্তৃক কিরূপে পূজনীয়া জননী এবং প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারে বিরাগী হইয়া, সন্ন্যাসীবেশে স্বর্গীয় শান্তি বিস্তার জন্য এ জগতে বহির্গত হয়েন, এখন আমরা সেই সময়ে উপস্থিত।

এক মাত্র পুত্রকে সংসার ত্যাগে উদ্যোগী এবং বৈরাগ্য-বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া, শচী দেবীর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাঁহার পুত্রকে সেই সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য যে, অনেক প্রবোধ, সান্ত্বনা, অনুনয়, অনুরোধ, উদ্বেগ, আশঙ্কা, স্বকরুণ বিলাপ, কাতরভাব প্রকাশ করেন, তদ্দর্শনে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? হায়! যখন মহাপুরুষের মনে স্বর্গীয় শান্তি জ্যোতিঃ উদ্ভাষিত এবং বিশ্বজনীন মঙ্গল-সাধন-কামনার উদ্রেক হয়, তাঁহাকে তখন স্বকার্য্য সাধনে নিরস্ত করিতে যাওয়া বৃথা। চৈতন্য দেব যে, দেশমধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন করিয়াছেন, চারিদিকে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহুল্য প্রচার করেন, এবং জনসাধারণ মধ্যে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মমতবাদ বদ্ধমূল করিয়াছেন, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ অদ্যাপিও বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়।

চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বন এবং বৈরাগ্যাবলম্বন সম্বন্ধে অনেকে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন। কেহ কেহ কহেন যে, চৈতন্য দেবের অগ্রজ বিশ্বরূপ, অল্প বয়সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বনে সংসার

ত্যাগী হইয়াছিলেন, সুতরাং চৈতন্য দেবের হৃদয়ে সেই ঘটনাটীর স্মৃতি দৃঢ়রূপে সমঙ্কিত হইয়াছিল; অন্যপক্ষে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেবল বঙ্গদেশ নহে, প্রায় সমগ্র ভারতে বিভিন্ন প্রচারক কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এই দুইটী কারণই পুণ্যচেতা চৈতন্য দেবকে প্রচারকার্য্যে দৃঢ়ব্রতী করিয়াছিল, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই আইসে যে, উক্ত ঘটনা দুইটী চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে, এই বুঝিতে হয় যে, চৈতন্য দেবের ধর্ম্মপ্রচার যেন যুগের হুজুকস্বরূপ—সমসাময়িক লোকসাধারণের মতবাদের তরঙ্গের মত। উপরোক্ত দুইটী ঘটনা যে, বাস্তবিক সত্য, অবশ্য সে সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না; কারণ সেই ঘটনাগুলি ইতিহাসের কথা। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনেকগুলি প্রচারক যে, দেশ মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের সকল যুক্তিই যে অভ্রান্ত সত্য, ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? দেখা যায় যে, এক সময়ে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে সাময়িক প্রগাঢ় পণ্ডিতমণ্ডলী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ঘটনাগুলি হইতে এই এই ফল প্রসূত হইবেক, কিন্তু অনেক স্থলে প্রতীয়মান হয় যে, সেই পণ্ডিতবর্গের সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি-পূর্ণ হইয়াছিল, কারণ সেই ঘটনাগুলির ফল তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের বিপরীতরূপে দৃশ্য হয়। অতএব কি সূত্রে কি ঘটে, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। আমাদিগের মনোমধ্যে যেরূপ মতবাদের উদ্রেক হয়, সেইটীই ঠিক বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি এবং তদনুসারে কাজ করিতে সতত চেষ্টিত থাকি, এবং সেই মতবাদ সমর্থন জন্য সংগৃহীত এবং অনুমিত সমস্ত যুক্তি প্রয়োগে প্রবৃত্ত হই। আর্য্য ঋষি যে, মনুষ্যের ভাগ্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" এই উক্তিটী আমাদিগের মনে বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

মহাত্মা চৈতন্য দেব, কেবলমাত্র কোন এক সম্প্রদায় নহে, সকল জাতীয় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু এবং মুসলমান কেবল এই দুটী জাতি তৎকালে ভারতের প্রধান অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং এই উভয় জাতিই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে অশেষ উপকার লাভ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতি সার্ব্বভৌমিক সাম্যভাবের উপর নিহিত। মহাত্মা চৈতন্য দেবের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্ম-মতবাদে ইহা বুঝা যায় যে, হিন্দু এবং মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে অতি সামান্য নীচজাতীয় ব্যক্তিও বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয়ে সমান মুক্তি লাভে সমর্থ এবং সকলেই বিশ্বাস এবং ভক্তিসূত্রে পবিত্রতা লাভে সক্ষম হয়। দৃঢ় অটল বিশ্বাস এবং অবিশ্রান্ত ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকাই চৈতন্য দেবের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান অর্থাৎ পূজা অপেক্ষা হৃদয়মধ্যে ভগবানের চিন্তা এবং মনে মনে হরিনাম জপই মুক্তিলাভ করিবার প্রধান পন্থা, এবং কলিতে একমাত্র হরিনামই মুক্তির সোপান ইহাই তাঁহার মত। ধর্ম্মগুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন তাঁহার ধর্ম্মের দৃঢ় আদেশ। কিন্তু চৈতন্য দেব তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মগুরুকে পিতা এবং শিক্ষকের ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবে, কদাচ ভগবানের ন্যায় ভক্তি করিবে না।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে চলিত সনাতন ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য যেমন আত্মার মুক্তি সূত্রে পরম গতি লাভ, চৈতন্য দেবের ধর্ম্মমতবাদের উদ্দেশ্যও সেইমত। তবে চৈতন্য দেবের মত যে, আত্মার মুক্তি কেবল পুনর্জ্জন্ম হইতে নিবৃত্তি বুঝায় না। দেহান্তর প্রাপ্তি রহিত এবং সকল প্রকার পাপ এবং কলঙ্ক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেই আত্মা মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। মুক্তি লাভ হইলে, যে পবিত্র ধামে অলৌকিক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশমান, যথায় কোন প্রকার পাপ প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, আত্মা তখন তথায় অনন্তকাল অবস্থান করে, অথবা ভগবান নারায়ণ যথায় ঐশিক দিপ্তীতে ব্যাপ্ত, যেখানে

ভগবান নশ্বর অবতার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান না, মায়ামরিচীকার বহু দূরবর্ত্তী সেই বৈকুণ্ঠধামে আত্মা তখন বিরাজ করিয়া, পূর্ণ শান্তি এবং ভূমানন্দ লাভ করিতে থাকে।

য়ুরোপীয় মনীষীগণ, চৈতন্য দেবের ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছেন যে, চৈতন্য দেবের ধর্ম্মমতবাদের যে অন্তিম লক্ষ্য—চরমে ঈশ্বরে লীন হইয়া ভূমানন্দ সম্ভোগ, এই ভাবটী শ্রবণ করিতে যাইলেই অবশ্যই স্মৃতিপথে উদিত হয় যে, ফরাসী দেশে ধর্ম্মসংস্কার কালে এই ভাবটী বিশেষ রূপে তথায় অনুভূত হইলেও লোকে কিন্তু প্রাচীন মনোহর ধর্ম্মভাবকে অবলম্বন করিয়া, ভূমানন্দ ও মনের শান্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। উক্ত পণ্ডিতগণ আরও কহেন যে, যেমন মাদাম গায়োন আত্মার মুক্তিসাধন নদীর স্রোতের ন্যায় বলিয়া উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, চৈতন্য দেবও সেইমত ভগবানের সহিত আত্মার সংমিলন সাধন করিতে হইলে, কতরূপ অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়, তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আত্মার মুক্তিসাধন করিতে হইলে, প্রথমে বৈরাগ্য বা শান্তি ভাব অবলম্বন করিতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ভগবানের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা বা দাস্য ভাব। তৃতীয় শুদ্ধ ভাব। চতুর্থ বাৎসল্য ভাব এবং সর্ব্বশেষে মাধুর্য্য ও প্রেম ভাব। বঙ্গের গৌরবস্থল পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বসম্পাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় পুস্তকের অবতারণায় এই মর্ম্মের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মসেবক প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মাচারে নিযুক্ত থাকিয়া বিষয়-বাসনা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। দ্বিতীয়াবস্থায় হৃদয় মধ্যে ভগবানের পূজা এবং নাম স্মরণ করিবে। তৃতীয়াবস্থায় সম্পূর্ণ পবিত্র ভাব অবলম্বন করিবে। চতুর্থাবস্থায় ভগবানের সহিত আত্মা এবং মনের সম্পূর্ণ সংমিলন। কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ না হইয়া, কেবল মাত্র ভক্তিযোগেই হইয়া থাকে। প্রেমিকের ন্যায় ঈশ্বরালিঙ্গনে আগ্রহ প্রকাশ, সময়ে সময়ে অমানুষিক ঈশ্বরপ্রেমে মত্ততা প্রাপ্তি ও কখন কখন ভগবচ্চিন্তায় মোহ বা দশা প্রাপ্তি।

এই গুলিই আত্মার মুক্তি সংগ্রহের উপায়, এবং এই সকলের জন্য সকলেরই চেষ্টিত থাকা কর্ত্তব্য। ভক্তিযোগেই ঈশ্বরে প্রেমভাব জন্মে। এরূপ ঈশ্বর-প্রেমভাব, প্রথমাবস্থায় প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় সম্বন্ধবন্ধন করিয়া দেয়। দ্বিতীয়াবস্থায় ভগবানের সহিত সুহৃদ্ভাব, তৃতীয়াবস্থায় নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহভাব এবং সর্ব্বশেষে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা আবশ্যক।

সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্যেই মহাত্মা চৈতন্য দেবের শিষ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়, ছয় জন আদিম গোস্বামীকে চৈতন্য দেবের প্রধান শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কি বিবাহিত ও কি অবিবাহিত সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। এই সম্প্রদায় মধ্যে পরিব্রাজক, ভিক্ষুক এবং বৈরাগী দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগুরুগণ সংসারাশ্রমী এবং বিবাহিত পুরুষ। ধর্ম্মগুরুগণের স্ত্রীরাও দীক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। প্রায় সকল ধর্ম্মগুরু গোস্বামীদিগের বাটীতেই ভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত এবং পূজীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের নানা স্থানে এখনও বৈষ্ণবদিগের আখড়া বা মঠাশ্রম দৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক এবং ভিক্ষুক বৈষ্ণব নরনারীগণ তথায় অবস্থান করে।

মহাত্মা চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণব-রমণীদিগের ধর্ম্মাধিকার বিষয়ে উন্নতির চিহ্ন লক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকদিগেরও ধর্ম্মাধিকার আছে বলিয়া, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় প্রবল তর্কবাদ উপস্থিত করায়, তাহার ফলস্বরূপ বৈষ্ণব-রমণীদিগের উক্ত স্বত্বাধিকার লাভ ঘটে। বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় অবিবাহিত নরনারী, ধর্ম্মসেবক ও সেবিকারূপে অবস্থান করে, এমত লক্ষিত হয়। আখড়ানিবাসিনী বৈষ্ণবীরা মস্তক মুণ্ডয়ন করিয়া কেবলমাত্র শিখা ধারণ করিয়া থাকেন। উক্ত আখড়ানিবাসী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ সময়ে সময়ে ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন, ও গৌরাঙ্গ দেবের গুণসংকীর্ত্তন এবং নৃত্য করিতে থাকে। উক্ত বৈষ্ণবীরা সংসারাশ্রমবাসিনী রমণীদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন।

মহাত্মা চৈতন্য দেব, ধর্ম্মের এতদূর উচ্চ শৃঙ্গে আরূঢ় হইয়াছিলেন

যে, তাহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জীবনী অটল দৃঢ় বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদিগের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞজনের নিকট অমানুষিক বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং তাঁহার চরিত্র ঐশিক দীপ্তিতে প্রভাসিত। পুণ্যচেতা চৈতন্য দেব, জন সাধারণের মধ্যে রীতিমত প্রণালীতে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যারম্ভ করেন। ভগবদ্গীতা কিরূপ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ, তাহার পরিচয় দান করা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অসম্ভব, তবে এক কথায় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এরূপ গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। চৈতন্য দেব, সর্ব্বলোক-সাধারণ মধ্যে ভগবদ্গীতার সার গুরু অর্থ বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত করিয়া ইহার প্রতি সকলেরই ভক্তি দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতি অপ্রত্যক্ষে এবং প্রত্যক্ষে এরূপভাবে বিরাজিত এবং আমরা তাহাতে এরূপ অভিভূত যে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। যদি কেবল মাত্র কোন এক সম্প্রদায় মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত থাকিত, এবং জন সাধারণে উক্ত ধর্ম্মে আকৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে অবশ্য উক্ত ধর্ম্মনীতির প্রাবল্য আমরা দূর হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম। যে ধর্ম্মনীতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছে, যে ধর্ম্মনীতি জনসাধারণের রুচি এবং সংস্কারস্বরূপ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মনীতি কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, তাহার প্রাবল্য উপলব্ধি করিতে লোকে চেষ্টা পায় না। কেবল মাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতির আলোচনায় এবং লোকসাধারণের রুচি ও সংস্কার অবলোকনে এই কথাটী যে সত্য, তাহা আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই। দেখা যায় যে, আজি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদিগের মৃদঙ্গের সুমধুর ধ্বনি এবং কীর্ত্তনের কমনীয় সুর, প্রত্যেক বঙ্গবাসীকেই বিমুগ্ধ করিতেছে, হরি-প্রেমে মাতোয়ারা করিতেছে, হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের প্রবল উদ্রেক করিতেছে। কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর জাতীয় আদরের ধন। চৈতন্য দেব এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্ত্তৃকই বাঙ্গা-লায় প্রথম কীর্ত্তন-প্রথা প্রচলিত হয় এবং বোধ হয়, কথকতা-প্রণালীও এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র চৈতন্য দেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় শান্তিপূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তার, জাতীয়

জীবনে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য বিস্তার, সাধারণ্যে ধর্ম্মশিক্ষাপ্রচার, ভক্তি, বিশ্বাস এবং ভগবদ্‌প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তার হইয়াছিল।

য়ুরোপখণ্ডের অধিবাসীগণের মধ্যে মার্টিন লুথার, জন নক্স, কলভিন, উইক্লিফ প্রভৃতি কর্ত্তৃক যে ধর্ম্মবিপ্লব সাধন, ধর্ম্মান্দোলন, ধর্ম্ম-শিক্ষা দান প্রভৃতি মহাকাণ্ডসকল হইয়াছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক সেইমত মহান কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে বিবৃত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে ধর্ম্মজীবন বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক সংসারত্যাগী বৈরাগী ছিলেন এরূপ লক্ষিত হয়। বোধ হয়, বৈষ্ণব-ধর্ম্মনীতির দ্বারাই নিরামিষ ভোজন, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং সার্ব্বজনীন সাম্যভাব বঙ্গদেশে বিশেষ-রূপে বদ্ধমূল হয়। বাঙ্গালায় হরিনামের মাহাত্ম্য এত গভীররূপে বদ্ধ-মূল যে, হিন্দুদিগের সকল সম্প্রদায়ের লোকই—যাঁহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত নহেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত মৃত দেহ সৎকার জন্য যথাস্থানে লইয়া যাইবার সময় হরিনামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এখন জাতির মধ্যে প্রত্যেক হিন্দুই বলেন যে, কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই।

কিন্তু হায়! মহোপদেশপূর্ণ ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম, মহাত্মা চৈতন্য দেবের পবিত্র আদর্শ জীবনী, বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারকগণের জ্বলন্ত উদ্যম, গভীর তত্ত্বোপদেশ, যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বাঙ্গালার অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিল, আজি সেগুলি আর সে সম্প্রদায়কে সমুত্তোলিত করিতে পারে না। এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেন অবনতি প্রাপ্ত বলিয়া লক্ষিত হয়। যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মরূপ পবিত্র পুষ্প এক সময়ে সমস্ত ভারতে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া, প্রকৃতিকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, আজি যেন তাহা হিমানীপাতে ম্রিয়মান।

বনবিহারী দেবদেবীর অপূর্ব্ব প্রেমলীলা যেমন বনকুসুম-সৌরভে আমোদিত, রাধাকৃষ্ণের কমনীয় কুঞ্জবনের প্রেমলীলা সেইমত স্বর্গীয় সৌরভে রমণীয় হইলেও বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহা যথেচ্ছ বিলাসিতার আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্ম-সেবক সাধু হরিদাসের

পবিত্র জীবনী বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণকে আর ধর্ম্ম নীতি-মুখে আনয়ন করিতে সক্ষম হয় না। আজিও লোকসাধারণে হরিদাসের সাধু জীবন বিস্মৃত হইতে পারে নাই। মুসলমান শাসনকর্ত্তা যখন ভক্ত হরিদাসের কঠোর ধর্ম্মজীবন ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞায় দুষ্টা বারবণিতাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, আহা কি আশ্চর্য্য! প্রবল চরিত্রবলের নিকট—পবিত্র ধর্ম্ম জীবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দুষ্টা বারবনিতা অবশেষে নিজেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পবিত্র পথের পথিক হইল! বাস্তবিকই মহাপুরুষগণের পবিত্র ধর্ম্মতেজ এবং গভীর হৃদয়ভেদী বিশ্বাস বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে হরিদাসের ন্যায় বহুল সাধু মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নারদ প্রভৃতি মহামহা ঋষিগণের বোধাতীত, সেই ধর্ম্মের অবনতিতেকোন্ সহৃদয়ের মনে না দুঃখোদয় হয়? আবার সেই ধর্ম্মের পুন-রভ্যুদয়ে কাহার না হৃদয় আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়?

মনুষ্যসমাজ।

"সমাজ" সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে মানস করিয়াছি। এ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সহিত যাহা আলাপ হইয়া থাকে, সেই সকল ভাবকে যথাযোগ্য প্রণালীতে বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ।

বাস্তবিক সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে অনেক কথা বুঝিতে হইবে, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা বিষয়ের উত্থাপনারও আবশ্যক। একে একে সেই সকল কথার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে, এবং বিষয়গুলির পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, আমরা সহজেই মনুষ্যসমাজকে বুঝিতে পারিব, এ প্রকার আশা করিতে পারা যায়। এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাদৌ আমাদের মনোমধ্যে এরূপ প্রশ্ন উঠা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে যে, "বাস্তবিক মনুষ্যসমাজ কি অন্য কিছুই নহে —কেবল মাত্র উইয়ের ঢিপি সদৃশ? শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা সমাজ মধ্যে বিরাজিত থাকিলেই কি যথেষ্ট?" মনের ভিতর কেমন একটা খটকাও আসে, অথচ সহসা সে সমস্যা পূরণ করাও আমাদিগের বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত হয় না। সমস্যা এই যে, যথার্থই কি মনুষ্যের এত যত্ন, এত শ্রম, এত উদ্যম-উদ্দীপনা, সমস্তই পণ্ডশ্রম—বৃথা ভস্মে ঘৃত নিঃক্ষেপ সদৃশ? বাস্তবিক কি মানবসমাজ এত সংকীর্ণ ভাবের উপর নিহিত? বাস্তবিক কি কেবল মাত্র শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা এবং আলস্য-বিলাসিতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব পরিসমাপ্ত হয়? এই সমস্যাটীকে গভীর চিন্তামুখে নিঃক্ষেপ না করিলে, সহজে মীমাংসা করা দুরূহ।

আমার বিবেচনায় ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, এই প্রশ্নটীর সহজ মীমাংসার পথ—সন্তোষজনক সিদ্ধান্তের পথ পরিষ্কার হইতে পারে। প্রথম কথা—মনুষ্যকে লইয়াই সমাজ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি, নৈতিক নিয়ম এ জগতে কেবল মাত্র জীবশ্রেষ্ঠ মানবেই বিন্যস্ত। আবার সেইগুলি হইতেই সভ্যতার সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ, মনুষ্যের সভ্যতারও অপেক্ষা করে। "রোমের ইতিহাসে" একটী সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্প আছে যে, হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি উদরের প্রতি কোপ না করিয়া, তাহাদিগের স্বকীয় কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন করে, এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝে, তাহা হইলে আর উদরের প্রতি তাহাদিগের কোপ প্রকাশ করিবার কোন হেতু থাকে না। সেইরূপ মানব, সমাজ, এবং সভ্যতা, এই তিনটির পরস্পরের সম্বন্ধ কি, পরস্পরের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব কি, তাহা জানিতে পারিলে, উপরোক্ত প্রকার ঘৃণা বা ঔদাস্য প্রকাশের কোন কারণ থাকে না।

কি সভ্য, কি অসভ্য সকল অবস্থাতেই মনুষ্য একত্র মিলিয়া মিশিয়া দিন যাপন করিতে অভিলাষী। সেই অভিলাষটি যে, স্বতঃসিদ্ধ, তাহার প্রমানও দেদীপ্যমান। সেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবটী জগতের প্রত্যেক প্রান্তের প্রত্যেক অবস্থার মানবসমাজের মধ্যে এতদূর প্রবলরূপে বিরাজিত যে, তদ্দৃষ্টেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই একত্র বসবাস কামনা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় কি না। একত্র বসবাস-কামনাই সমাজ সৃষ্টির আদি কারণ; সেই কারণ হইতেই মনুষ্যসমষ্টিকে এক একটী দল, সম্প্রদায় বা জাতিতে পরিণত করে, এবং সেই দল, সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে একরূপ স্বার্থ বা একরূপ সংস্কার, এবং রুচি দেখা দেয়। সেই গুলিই জাতি বা সম্প্রদায়গত দৃঢ়তা, এবং একতা সাধন করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই ধীরে ধীরে সমাজ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কোন বিচক্ষণ ফরাসী পণ্ডিত, সমাজের আদিম সংগঠন সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"একরূপ মনোভাব এবং একপ্রকার মতবাদ—সেই মনোভাব এবং

মনুষ্যসমাজ।

"সমাজ" সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে মানস করিয়াছি। এ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সহিত যাহা আলাপ হইয়া থাকে, সেই সকল ভাবকে যথাযোগ্য প্রণালীতে বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ।

বাস্তবিক সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে অনেক কথা বুঝিতে হইবে, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা বিষয়ের উত্থাপনারও আবশ্যক। একে একে সেই সকল কথার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে, এবং বিষয়গুলির পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, আমরা সহজেই মনুষ্যসমাজকে বুঝিতে পারিব, এ প্রকার আশা করিতে পারা যায়। এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাদৌ আমাদের মনোমধ্যে এরূপ প্রশ্ন উঠা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে যে, "বাস্তবিক মনুষ্যসমাজ কি অন্য কিছুই নহে —কেবল মাত্র উইয়ের ঢিপি সদৃশ? শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা সমাজ মধ্যে বিরাজিত থাকিলেই কি যথেষ্ট?" মনের ভিতর কেমন একটা খটকাও আসে, অথচ সহসা সে সমস্যা পূরণ করাও আমাদিগের বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ব হয় না। সমস্যা এই যে, যথার্থই কি মনুষ্যের এত যত্ন, এত শ্রম, এত উদ্যম-উদ্দীপনা, সমস্তই পণ্ডশ্রম—বৃথা ভস্মে ঘৃত নিঃক্ষেপ সদৃশ? বাস্তবিক কি মানবসমাজ এত সংকীর্ণ ভাবের উপর নিহিত? বাস্তবিক কি কেবল মাত্র শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা এবং আলস্য-বিলাসিতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব পরিসমাপ্ত হয়? এই সমস্যাটীকে গভীর চিন্তামুখে নিঃক্ষেপ না করিলে, সহজে মীমাংসা করা দুরূহ।

আমার বিবেচনায় ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, এই প্রশ্নটীর সহজ মীমাংস্যার পথ—সন্তোষজনক সিদ্ধান্তের পথ পরিষ্কার হইতে পারে। প্রথম কথা—মনুষ্যকে লইয়াই সমাজ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি, নৈতিক নিয়ম এ জগতে কেবল মাত্র জীবশ্রেষ্ঠ মানবেই বিন্যস্ত। আবার সেইগুলি হইতেই সভ্যতার সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ, মনুষ্যের সভ্যতারও অপেক্ষা করে। "রোমের ইতিহাসে" একটী সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্প আছে যে, হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি উদরের প্রতি কোপ না করিয়া, তাহাদিগের স্বকীয় কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন করে, এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝে, তাহা হইলে আর উদরের প্রতি তাহাদিগের কোপ প্রকাশ করিবার কোন হেতু থাকে না। সেইরূপ মানব, সমাজ, এবং সভ্যতা, এই তিনটির পরস্পরের সম্বন্ধ কি, পরস্পরের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব কি, তাহা জানিতে পারিলে, উপরোক্ত প্রকার ঘৃণা বা ঔদাস্য প্রকাশের কোন কারণ থাকে না।

কি সভ্য, কি অসভ্য সকল অবস্থাতেই মনুষ্য একত্র মিলিয়া মিশিয়া দিন যাপন করিতে অভিলাষী। সেই অভিলাষটি যে, স্বতঃসিদ্ধ, তাহার প্রমানও দেদীপ্যমান। সেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবটী জগতের প্রত্যেক প্রান্তের প্রত্যেক অবস্থার মানবসমাজের মধ্যে এতদূর প্রবলরূপে বিরাজিত যে, তদ্দৃষ্টেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই একত্র বসবাস কামনা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় কি না। একত্র বসবাস-কামনাই সমাজ স্থষ্টির আদি কারণ; সেই কারণ হইতেই মনুষ্যসমষ্টিকে এক একটী দল, সম্প্রদায় বা জাতিতে পরিণত করে, এবং সেই দল, সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে একরূপ স্বার্থ বা একরূপ সংস্কার, এবং রুচি দেখা দেয়। সেই গুলিই জাতি বা সম্প্রদায়গত দৃঢ়তা, এবং একতা সাধন করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই ধীরে ধীরে সমাজ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কোন বিচক্ষণ ফরাসী পণ্ডিত, সমাজের আদিম সংগঠন সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"একরূপ মনোভাব এবং একপ্রকার মতবাদ—সেই মনোভাব এবং

মতবাদ যে প্রকারের এবং যেরূপ উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হউক না কেন—তাহাই সমাজ সংগঠনের মূল সূত্র।”*

সমমনোভাব এবং সমমতবাদ, মনুষ্যমণ্ডলীকে সমাজবদ্ধ করিয়া দিলে, অপর কতকগুলি কারণ সময়ে সময়ে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এবং উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত করে। কিন্তু সেই বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টির পূর্ব্বেই মনুষ্য প্রথমে সমাজবদ্ধ হইলে, সেই সমাজ মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ পাইলে এবং ধর্ম্মনীতির প্রাবল্য বিস্তৃত হইলে, সেই সমাজবদ্ধ মানবমণ্ডলীর চরিত্র, রুচি, আচার, ব্যবহার সময়োপযোগী রূপে সংস্কৃত হয়, এবং পরিশেষে জাতিকে সভ্যতা-সোপানে আরোহণের সহায়তা করে। জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, এবং অভিজ্ঞতা, এই কয়টী ধীরে ধীরে মনুষ্যমণ্ডলীকে তাহাদিগের আশু প্রয়োজনীয় অভাবগুলি বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য তখন অভাবই আবিষ্কারের কারণ বুঝিয়া, সমাজের রীতিনীতি, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিধি প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। জ্ঞান এবং সভ্যতা সেই বাধ্যতা আনিয়া দেয়।

জগদীশ্বর কেন এ জগতে মানব-মানবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন জীবশ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছেন, তাহার আজিও মীমাংসা হয় নাই, হইবে কি না তাহা পরের কথা। এখন সমস্তই “তাঁহার ইচ্ছা” বলিয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট নরনারী যে, সমাজ সংগঠিত করিয়া, সমাজকে উন্নতি-মুখে লইয়া যাইতেছে, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কেবল পুরুষ নহে, প্রকৃতি পুরুষ—নরনারী উভয়কে লইয়াই সমাজ। একটীকে ছাড়িয়া আর একটীকে লইয়া সমাজ হইতে পারে না। এই জন্যই একত্র বসবাস-কামনা হইতেই ক্রমে একত্র সহবাস-কামনা দেখা দেয়। সেই একত্র সহবাস-কামনা হইতেই পবিত্র পরিণয়-বন্ধন— শুভ সংমিলনের সৃষ্টি। সেই বিবাহই সমাজ-বন্ধনীগুলিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দেয়। জগদীশ্বর

* “A similar sentiment and doctrine, whatever may be its nature or object is the first condition of the social state.”—
Guizot's History of civilization—vol. III, p. 20.

মানব-মানবীর হৃদয়ে স্নেহ, মমতা, প্রীতি, দয়া, অনুরাগ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তিবীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, বিবাহ-বন্ধনারম্ভ হইতেই সেইগুলি সময় বিশেষে একে একে অঙ্কুরিত এবং ক্রমে ফল-ফুল-শোভিত হইয়া, শেষ স্বর্গীয় সৌরভে সমাজকে আমোদিত করে। তখন স্বর্গীয় সংমিলনরূপ জ্বলন্ত জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে, নরনারী, আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব প্রভৃতিকে দেখিয়া, স্বভাবতঃই সমাজের উপর মমতা-বারিবর্ষণ করিতে থাকে। তখন প্রত্যেক নরনারীর স্বাতন্ত্র্য ও ভেদভাব এবং মানসিক সংকীর্ণতা সেই মমতাবৃষ্টির দ্বারা বিধৌত হইয়া, ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সহিত কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ নহে, ভবিষ্য সম্বন্ধও আছে, ইহা স্মরণ করিয়া, সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনে যত্নবান হয়। সেই সূত্রেই সামাজিক স্বত্ব, দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত এবং সেই সূত্রেই উত্তরাধিকারিত্ব প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

কোন্ সূত্রে কি ঘটে, সকল সময় ইহার নির্দ্দেশ করা বড় সহজসাধ্য নহে। আমরা যখন সামান্য বিষয়ের সহজে সকল সময়ে মীমাংসা করিতে পারি না, তখন আমরা জটিল কূট প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম, এ কথা বলিলে অধিক কিছু বলা হয় না। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ধর্ম্ম এবং মূলনীতি, মানবসমাজকে উপকৃত করিয়াছে কি না, অথবা উন্নতি-সোপানে আরূঢ় করিয়াছে কি না? চিন্তাশীল বাকল এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এস্থলে গ্রহণ করা যাউক। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব কিরূপ বিরাজিত, তাহা অবগত হইতে পারিলেই সেই জাতির জ্ঞানাধিক্য কতদূর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেই জাতি উন্নতি-মুখে উত্থিত হইতে পারে না। বাকল, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে, অনেকানেক পাদরী, অসভ্য আফ্রিকানদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই ধর্ম্মপ্রচার সূত্রে সেই জাতিকে কি উন্নতিশীল করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কখনই না। কেবল মাত্র জ্ঞানবলেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা বুঝা যায়। যদিও সুবিজ্ঞ বাকল এক

কথায় এমত বলেন নাই যে, ধর্ম্ম দ্বারা সমাজের কোন উপকার হয় না, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এরূপ ধারণা হয় যে, ধর্ম্ম দ্বারা যে কোন জাতির বিশেষ কোন উপকার বা উন্নতি হয় না। কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞানই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা অনুভব করিতে সক্ষম; বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে যে কোন প্রকারে অসভ্য এবং জ্ঞানহীন জাতির মধ্যে প্রচলিত করিলে, সে জাতি সেই ধর্ম্মের দ্বারা কোন উপকার সংগ্রহ করিতে পারে না।

প্রগাঢ় পণ্ডিত বাকলের মতের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করা অবশ্যই আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু অপরাপর পণ্ডিতমণ্ডলী এ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, এস্থলে সেগুলির সার মর্ম্ম প্রকটিত করিলে, অবশ্যই এসম্বন্ধে মীমাংসার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইবে, এমত আশা করা যাইতে পারে। কেন, কি সূত্রে, কি কারণ নিবন্ধন, সমাজ উন্নতি-পথে আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের মতবাদ অবশ্যই সেই মীমাংসার পক্ষে উপযোগী। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝি, এক নিয়ম বা এক বিধি জগতের সকল প্রান্তের সকল জাতির মধ্যে খাটে না। আবার যে কোন প্রকারে হউক, তাহা খাটাইতে যাইলেই বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। কোন এক জাতি বা সম্প্রদায় মধ্যে কোন এক মূল নিয়মের ফল না দেখিতে পাইলে, সেই মূল নিয়মটী যে একেবারে অকার্য্যকর ইহা বলা বড় কঠিন। সহসা কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়াও আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নহে। ধর্ম্ম অথবা মূলনীতিগুলির দ্বারা সমাজ উন্নত হয় কি না—আরও পরিষ্কার করিয়া বলি, এ অবধি কোন মানব-সমাজ উপকৃত বা উন্নত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

জ্ঞানের আধিক্য বা অনাধিক্য সূত্রে জাতির মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আদর বা অনাদরের পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বীকার করি, মানবের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ পাইলেই হিতাহিত বিবেচনা শক্তি প্রবল হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মানব-চরিত্র আজিও

সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়ায়, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ বিকাশ না পাওয়ায়, অনেক সময়ে আমাদিগের জ্ঞানে যাহা অনুমোদন করে, তৎসমস্তই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় না। এ জগতে জ্ঞানবান ব্যক্তি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের অনুমোদিত প্রত্যেক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, এমত বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি বিরল। ধর্ম্ম বা মূলনীতিগুলি হইতে সমাজের আদিম অবস্থায় কোন উপকার হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে স্যার আর্চিবল্ড আলিসন "য়ুরোপের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এইমত ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"যে সময়ে লোকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল না, এবং কুসংস্কারের প্রাবল্য অনুভব করিত না, সেই সময়ের আধুনিক ইতিবেত্তাগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী অশান্তিজনক সময়ে ইহার (খৃষ্টধর্ম্ম ও তাহার মূলনীতির) গুরুত্ব বিশেষ-রূপে স্বীকার না করিয়া, মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। যে সময়ে মনুষ্যের যুক্তির শৈশব অবস্থা ছিল, লোকসাধারণের রিপুসমূহ উদ্দাম ছিল এবং মূর্খতা সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল, সেই সময়ে কেবলমাত্র ধর্ম্মনীতির উপকারিতা প্রচার দ্বারা সেই লোকসাধারণের মনোবৃত্তিসমূহকে বশীভূত করিয়া, রিপু সমূহকে বশবর্ত্তী করাইয়া, উৎপীড়ন-কামনাকে প্রশমিত করা যায়, নিরীহ লোকদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং পাশবিক বলের উপর মানসিক বলের প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারা যায়, ইহা সেই ইতিবেত্তাগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। জগতের যে অসভ্য অবস্থায় লোক-হৃদয়ে ধ্বংসধারী কামনা প্রবল ছিল, জগতের সর্ব্বত্র রক্তপাত হইতে থাকিত, যদি আমরা একবার মনোমধ্যে সেই সময়ের অবস্থা কল্পনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সেই সময়ে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অদৃশ্য শক্তি—ধর্ম্মনীতিই সেই অশান্তি, বিগ্রহ এবং পাশবিক উপদ্রব নিবারণে সক্ষম ছিল। সেই ধর্ম্ম এবং নৈতিক বলের নিকট সশস্ত্র সৈন্যবেষ্টিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভয়ে কম্পিত হইতেন এবং লোক সাধারণে দুর্গ-প্রাকার মধ্যে আশ্রয় লইয়া যে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইতেন না, মঠের ক্রশ-চিহ্নের ছায়ায় আশ্রয় লইয়া, নিরাপদে সেই আত্মরক্ষা

করিতে পারিতেন, সাধারণ শিল্পাদির উন্নতি হইত এবং সাধারণ শান্তি রক্ষিত হইত, মার্জ্জিত যুক্তির নিকট ইহা যে কোন প্রকার বিচিত্র বিবেচিত হউক না, ইহার প্রাবল্য কিরূপ গুরুতর ছিল, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি।”*

ইতিহাসজ্ঞ গিবন সাহেব তাঁহার “রোমরাজ্যের পতন” নামক পুস্তকে বিমল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে স্বাভাবিক ও সামাজিক বিধিগুলি পালন ও ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

“যে রাজা—যাঁহার রাজ্যের সমস্ত শাসনশক্তি কেবল একমাত্র তাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি তাঁহার আচরণে যতই স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করুন না, তাঁহার রাজ্যের অধিবাসীগণ স্বাভাবিক ও সামাজিক নিয়ম সমুদয় পালন করেন, ইহা তাঁহার স্বার্থ। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি,

---

* Modern Historians living in an age when the shield of superstition was no longer required and influence unfelt have erred immensely in their estimate of its importance at an earlier and in a more unhappy period. They forgot that when reason is in its infancy, passion predominant and ignorance universal it is by images addressed to the senses alone that violence can be restrained, innocence protected or the supremacy of mental over physical strength asserted. But if we go back in imagination to the sanguinary passions and universal bloodshed of the dark ages, we shall feel the value of any influence how strange-soever in the eyes of enlightened reason which restrained the excess of power when no other means of coercing it existed; which made the Barons tremble before spiritual and therefore unseen power even in the midst of his armed bands; and secure that protection to industry under the shadows of the monastery's cross, which it would have sought in vain beneath the shelter of the castle wall." History of Europe, by Sir Archebald Alison. Vol. I. p. 19.

জ্ঞানের অনুমোদিত হইলেও তাহা লোকসাধারণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পালিত হওয়া অসম্ভব। উহাতে ধর্ম্মের উদ্দীপনাও নাই এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত করাইতে পারে না; উক্ত বিধি সকল লোকসাধারণের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বশবর্ত্তী করিতে সক্ষম না থাকায়, ও উক্ত বিধি সকল ভঙ্গ করিলে, তাহার দণ্ডও সম্ভবে না।

বিজ্ঞ ও জ্ঞানী শাসনকর্ত্তা লোকসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার এবং মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায়িত্ব ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত হয়, ইহা দেখিলে তিনি যথার্থই আনন্দানুভব করেন।"*

উপরি উদ্ধৃত দুইটী চিন্তাশীল ইতিহাসলেখক ধর্ম্ম ও মূলনীতি গুলি হইতে জাতির আদিম অবস্থায় কোন উপকার হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট জানা যায় যে, জাতির আদিম অবস্থায় ধর্ম্মনীতির সহায়তায় প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের প্রাবল্য সম্বন্ধে কেহ তর্ক তুলিতে পারেন না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে—সমগ্র জাতির মধ্যে জ্ঞানলাভের পন্থা এখনও সহজ এবং সুবিধাজনক হয় নাই। অন্য পক্ষে এ কথা সাহস সহকারে বলা

---

* Whatever latitude an absolute monarch may assume in his own conduct, whatever indulgence he may claim for his own passions, it is undoubtedly his interest that all his subjects should respect the natural and civil obligations of society. But the operation of the wisest laws is imperfect and precarious. They seldom inspire virtue, they can not always restrain vice. Their power is insufficient to prohibit all that they condemn, nor can they always punish the actions which they prohibit. * * * *

a prudent magistrate might observe with pleasure the progress of a religion which diffused among the people a pure benevolent, and universal system of ethics, adapted to every duty and every condition of life. (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. By Edward Gibbon. vol. II. p. p. 344 345.

যাইতে পারে যে, মনুষ্য-চরিত্র এত অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতেছে এবং মনুষ্য এখনও এত অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ যে, সকল বিষয়ের সহজে মীমাংসা বা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত কদলি-ভেলা যেমন এক তরঙ্গ সংঘাতে অন্য তরঙ্গ-মুখে পতিত হইয়া, আলোড়ন বিলোড়নে এদিক ওদিক নানাদিকে বিচালিত হয়, মনুষ্য-সমাজ সেইমত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হইয়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী এবং অশেষ প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্যের জন্মলীলা সমাপ্ত না হইলে, তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী বর্ণন হইতে পারে না, এ কথাটী যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের সমুদয় ক্রিয়ার সমাপ্তি না হইলে, তাহারও প্রকৃতরূপ বর্ণনা এবং সমুদয়ের তথ্য ও কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কারণ দেখিতে পাই, এক সময়ে যাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত, অপর পরবর্ত্তী সময়ে তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। অতএব পূজ্য আর্য্য ঋষিগণের বচন "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা" এই মহাবাক্যের সার অবলম্বন করিয়া চলাই আমাদিগের পক্ষে শুভজনক।

যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও মূলনীতি হইতে সমাজের আদিম অবস্থায় কোন উপকার লাভ হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে অপরাপর পণ্ডিতদিগের মত কি, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। পণ্ডিতদিগের মত যে, ধর্ম্ম ও মূলনীতি, সমাজের আদিম অবস্থায় এক প্রকার আবশ্যক হইয়াছিল। আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়া আমরা এ বিষয় হইতে অবসর লইব। সকলেই অবগত আছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম, সমগ্র যুরোপখণ্ডকে একধর্ম্মগতপ্রাণ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। যে সময়ে যুরোপবাসীগণ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় আসিতেছিল, সেই সময় হইতেই খৃষ্টধর্ম্ম, যুরোপখণ্ডকে একধর্ম্মগতপ্রাণ করিতে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মই জাতির জীবন। ধর্ম্মের মীমাংসা এখানে শেষ হইবার নহে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রয়ার কোলার্ড কহেন, মানব এই পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করে, এই পৃথিবীতেই মানবের লীলা খেলা আরম্ভ হয়, এবং এই পৃথিবীতেই লীলা খেলা পরিসমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা মানবের সম্পূর্ণ ভাগ্য প্রকাশিত হয় না। মনুষ্য, সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মনুষ্য, জীবনের মহান কার্য্য—সেই উচ্চ ভাবের বিকাশ—জগদীশ্বরে লীন হইবার কামনা—আর এক জগতে প্রবেশ, যাহা আমাদিগের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে না, সেই ভবিষ্য জীবন এবং অজ্ঞাত শুভ ফল লাভ।

যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে, সেই জাতির প্রাণ নাই, উদ্যম নাই এবং উৎসাহও নাই।

কেহ কেহ এরূপ কহেন যে, দেখ, যেখানে ধর্ম্মের অধিক প্রাদুর্ভাব সেই স্পেন দেশের অধিবাসীগণের অবনতি হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, স্পেন দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেকে অনেক অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচার করিয়াছিল বলিয়াই—ধর্ম্মের নামে লোমহর্ষণ কাণ্ডের ভয়াবহ অভিনয় করিয়াছিল বলিয়াই ধর্ম্মের নামে জাতির সেরূপ অবনতি সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইংলণ্ডের উন্নতিমূলক প্রত্যেক শুভজনক দেশহিতকর ব্যাপারেই পাদরীমণ্ডলী লিপ্ত ছিলেন। এবং তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহুল কূট প্রশ্ন লইয়া জাতি মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাদরীদিগের প্রাবল্য এবং ক্ষমতা রাজ্য মধ্যে এরূপ দৃঢ় হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের বিচক্ষণ এবং শক্তিশালী নরপতিগণ, খৃষ্টান-জগতের প্রধান গুরু রোমের পোপের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইলেও স্বদেশস্থ পাদরী মহাশয় গণের সহিত ভয়ে ভয়ে মিলিয়া মিশিয়া অনেক সময়ে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রীণ সাহেব কর্তৃক লিখিত ইংলণ্ডবাসীর ইতিহাস নামক গ্রন্থে অতি সুন্দর প্রণালীতে সেই বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত আছে।

জাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতিতে ব্যক্তিগত উন্নতি ঘটে। আবার ব্যক্তিগত উন্নতি সূত্রে, সমাজের এবং শেষ

জাতির উন্নতিও ঘটে। একটীর সহিত অপরগুলি এরূপ সুন্দরভাবে মিলিত যে, একটীর উন্নতিতে অপরগুলির উন্নতি আপনাপনিই ঘটিয়া যায়। এমন কি যখন কোন মানবের ধর্ম্মভাব প্রবল হয় এবং তাহার নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন সেই ব্যক্তির এমত একান্ত কামনা ও আগ্রহ জন্মে যে, তাঁহার যেমন ধর্ম্ম ও নৈতিকভাব পরিবর্ত্তিত এবং প্রবল হইয়াছে, লোকসাধারণের ধর্ম্মভাব এবং নৈতিক বল ও সেইমত প্রবল হউক। কি আশ্চর্য্য, সেইরূপ পরিবর্ত্তনটী তিনি যেন সে সময়ে লোকসাধারণের একান্ত অভাব এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন এবং তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। সেই প্রকার পরিবর্ত্তন জন্য এমন কি তিনি স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অবশেষে সেই বিষয়টী লইয়া মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। এই প্রকার নিয়মানুসারে মানবজাতির মহান্ হিতসাধক দেবতুল্য মহাত্মারা, জাতিকে এবং সমাজকে উন্নতির মুখে—সভ্যতার দিকে অগ্রসর করাইয়া গিয়াছেন। সেই সকল দেবসদৃশ মহাপুরুষেরা প্রথমতঃ আপনাকে, পরে স্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দকে পবিত্র ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিয়া, শেষ পৃথিবীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের যশোগান ও গুণকীর্ত্তন কোন্ মানবের মুখে না শুনা যায়?

এক্ষণে বুঝা গেল, স্থূল কথায় মনুষ্যের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতিতে মনুষ্যের উন্নতি ঘটে। বাহ্যিক হইতে যেমন আন্তরিক উন্নতি ঘটে, সেই মত আন্তরিক হইতে বাহ্যিক উন্নতি ঘটিয়া থাকে, ইহা উন্নতির একটী স্বাভাবিক নিয়ম এমত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সবিশেষ আলোচনায় সহজেই অনুভব হয় যে, মনুষ্য এখনও প্রকৃত উন্নতির সর্ব্বশেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে নাই। সীমান্তে গমন করিবার এখনও যেন অনেক পথ পড়িয়া আছে। মনুষ্য নিজে উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিতে না পারায়, সমাজের উন্নতিও সম্পূর্ণরূপ এবং সার্ব্বাঙ্গীন হয় নাই। এখনও সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য

যে সকল বিধি, যে সকল অনুষ্ঠান এবং যে সকল জিনিষের দরকার তাহা সংগৃহীত হয় নাই এবং যাহা যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ভবিষ্যতে সার্ব্বজনীন অভেদভাব কতদূর কি পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিবে, তাহা বুঝিবার শক্তি মনুষ্যের নাই। যদি প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন মনকে প্রশ্ন করেন যে, মনুষ্যের উন্নতি কি অবধি হইয়াছে, কতদূর ভবিষ্য আশা আছে, তাহা হইলেই আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিব যে, এখনও অনেক বাকি আছে এবং এখনও আমরা উন্নতির শেষ উন্নতচূড়া দেখিতে পাইতেছি না। যদিও মানব, বর্ষ গণনায় এ জগতে অনেক দিন হইল আসিয়াছেন, বহুবিধ সঙ্কটাপন্ন ও ক্লেশকর পথ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি এখনও অনেক পথ অতিক্রম করিতে বাকি আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া, আমাদিগের ক্ষোভ বা লজ্জা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশ্বজনীন শান্তির জন্য সমস্ত মানব এখন আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান সময়টী জ্ঞান লাভ ও শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সন্তোষ ও শান্তি স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার জন্য এখন সবিশেষ চেষ্টিত। কবিশ্রেষ্ঠ হোমর যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, "জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সময়াপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা সন্তোষজনক।"

পূর্ব্বে একস্থলে বলা হইয়াছে যে, কোন একটী মূলনীতি জগতের সকল অবস্থাপন্ন সকল জাতির মধ্যে সমান ফল প্রসব করিতে পারে না। যদি আমরা জগতের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন জাতির প্রতি দৃষ্টি দান করি, তাহা হইলেই এ কথার সত্যতা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। কোন এক সমাজের লোকদিগের মানসিক উৎকর্ষতা সবিশেষ সন্তোষজনক দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহার কদর্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। মানবের মূল উন্নতির নিয়মগুলি এরূপ পরস্পরের অপেক্ষা করে যে, যদি একটী মূল নিয়মের ক্রমিক উন্নতি হইতে থাকে, তাহা হইলে অপর গুলি পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখন আমাদিগের মনোমধ্যে দুঃখ

হয়, যেন কোন বিষয়ের অভাব বোধ হয় এবং মনের তৃপ্তি লাভ হয় না।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে যাবতীয় পদার্থেরই অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। সেই মূলসূত্রমত মানব-সমাজেরও অবস্থান্তর ঘটিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ ডারউইন এবং স্পেন্সারের মতে ক্রমবিকাশপ্রণালী (evolution theory) অনুসারে মনুষ্যজাতির ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, মানবসমাজ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; এক সময়ে যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা অসত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া যাইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত এরূপ অবস্থান্তর বা মতপরিবর্ত্তনকে সমাজের উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা আরও বলেন যে, ইহার দ্বারা জানা যায় যে, মনুষ্য, সমাজের যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, সেই অবস্থার রুচি ও সংস্কার পাইয়া থাকে। অবশ্য এমন লোকও অনেক দেখা যায় যে, তাঁহাদিগের রুচি ও সংস্কার, আমাদিগের রুচি ও সংস্কার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত। কিন্তু সমাজে এরূপ লোক অতি অল্পই বিরাজিত। অতএব বিভিন্ন সময়ের মনুষ্যসমাজ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত দেখান যে, দেখ, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মূলনীতিগুলির কিছুই অবস্থান্তর হইতেছে না, অথচ সমাজের উহা হইতে যথার্থ উপকার সাধিত হইতেছে।

কি কারণে বিভিন্ন সময়ে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন রুচি এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রচলিত হয়, তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। জ্ঞানের বিকাশ, ধর্ম্ম ও নৈতিক নিয়ম, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, পরিচ্ছদ, আমোদ, প্রমোদ ইত্যাদি কারণ হইতেই তাহা সম্পাদিত হয়।

খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লুথার বলিয়া গিয়াছেন, কোন এক দেশের উন্নতি, সেই দেশের রাজস্বের প্রাচুর্য্য, বা দুর্ভেদ্য দুর্গাবলী এবং সাধারণ হর্ম্ম্যাবলীর সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে না; সেই দেশের বিচক্ষণ অধিবাসী, শিক্ষিত সভ্য এবং চরিত্রবান ব্যক্তিবৃন্দের উপর

নির্ভর করে, কারণ তাঁহাদিগের উপরই প্রকৃত স্বার্থ, প্রধান বল এবং যথার্থ শক্তিই দৃষ্ট হয়। এই কথাগুলি যে, জলন্ত সত্য তাহা বলা বাহুল্য।

উপসংহারে বক্তব্য, মনুষ্যসমাজ এবং মনুষ্য-চরিত্র নানাপ্রকার কারণে সংগঠিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত, আদর্শ, জীবনী এবং সাহিত্য হইতে সমাজ, উন্নতিসাধনের সবিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হয়। স্বর্গীয় মহাপুরুষ দিগের উপদেশ এবং সত্যপূর্ণ বাক্যগুলি আমাদিগের কার্য্যকে অনেক পরিমাণে কর্ত্তব্য-রেখার মধ্যে চালিত করে। কিন্তু যদিও স্বর্গীয় মহা-পুরুষদিগের আদেশ এবং আদর্শ অবলম্বনে মানব, সমাজকে উন্নতিপথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টিত হয়, কিন্তু মানব নিজে শ্রমশীল, উদ্যোগী এবং চরিত্রবান না হইলে, সে চেষ্টা সফল হয় না। মানবমণ্ডলী পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং চরিত্রবান হইলেই করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সমাজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির মানসিক উৎকর্ষতা।

এ জগতে পুরুষ কেন স্ত্রীলোকের উপর আধিপত্য করিতেছে, নর নারীর কেন সংমিলন হইতেছে, বিবাহ-প্রথা মানবসমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়া সুখশান্তি বর্দ্ধন করিতেছে, এইগুলির আলোচনায় মহিলাদিগের মানসিক উৎকর্ষতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রায় সমগ্র সভ্য জাতি তাঁহাদিগের মহিলাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্ম-সংস্কার এবং দেশ-প্রথা অনুসারে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বোধ হয়, কেহই, কি নর কি নারী উভয়েরই মানসিক উৎকর্ষতা সাধন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। ভগবান, নর-নারীর হৃদয় মধ্যে যে মানসিক বৃত্তিবীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, তাহার উৎকর্ষতা স্বভাবের চতুর্দ্দিক দেখিয়া অলক্ষ্যে আপনা আপনি সম্পন্ন হইতেছে, অতএব ইহা হইতে বেশ অনুভূত হয় যে, ভগবান-দত্ত মানসিক বৃত্তির উন্নতি সাধন অতীব কর্ত্তব্য। যাঁহারা বর্ত্তমান য়ুরোপখণ্ডের কামিনীদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালী বিস্তৃতরূপে প্রচলিত দেখিয়া, প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় শিক্ষাপ্রণালী অতি বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল, এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা আমাদিগের মতে মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অবশ্য লীলাবতী, খণা, হঠী প্রভৃতি আর্য্যা ভারতললনা-দিগের নাম অদ্যাবধি আমরা বিস্মৃত হই নাই। তাঁহাদিগের মানসিক উৎকর্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় শিক্ষা অতি বিস্তৃতরূপে ভারত-ললনাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণিত হইতেছে না। পুরা-কালে য়ুরোপখণ্ডেও কামিনীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় শিক্ষাও অতি বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল না। আধুনিক য়ুরোপখণ্ডের আকৃতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আধুনিক য়ুরোপ

খণ্ড নানা জনপদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক য়ুরোপখণ্ডের চিত্রের সহিত পুরাকালের চিত্রের সাদৃশ্য করা যাইতে পারে না। পুরাকালে ভারত ও য়ুরোপখণ্ডের ললনাদিগের মানসিক বৃত্তি ও সামাজিক অবস্থার সমালোচনা করিলে, ভারতীয় আর্য্যা ললনাদিগের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া ধারণা হয়। একরূপ অবস্থা ও একবিধ সংস্কার দুইটী জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলে, অবশ্য তুলনায় সমালোচনার সুবিধা হয়। তত্রাপি যে শিক্ষা ভারতীয় ললনাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উহাদিগের শিক্ষার ভিত্তি, ধর্ম্ম এবং নীতির উপর নিহিত ছিল। পুরাকালে জগতের সমগ্র জাতির রমণীগণের মধ্যে শিক্ষা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল, এমত আশা করা অসম্ভব। তৎকালের ইতিবৃত্তের আলোচনায় দেখা যায়, পুরুষদিগের মধ্যেও সর্ব্বত্র শিক্ষা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল না। অধিকন্তু শিক্ষা দানের পন্থাও বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। তখন মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হয় নাই; অথবা সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্য বৃন্দের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা সুযোগও ছিল না। এমন কি য়ুরোপখণ্ডের পুরোহিতেরা জাতি মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রালাপের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। যদিও সম্রাট সার্লামেন, আলকুইনের পরামর্শ মতে বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীল ছিলেন, তত্রাপি জাতিসাধারণে উহার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভব করেন নাই, সুতরাং সম্রাট সার্লামেন এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অন্য পক্ষে মনুষ্যবৃন্দের বাহ্যিক অবস্থা তৎকালে উন্নতিমূলক ছিল না এবং আধুনিক মনুষ্য দিগকে যেরূপ বহুবিধ উন্নতিমূলক আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় সতত উত্তেজিত করিতেছে, এবং নানাবিধ আবিষ্কার ও কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর করিতেছে, তৎকালে এ সকল কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। অতুল সাহসী কলম্বস সবে মাত্র ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

এবং ইহার পরবর্ত্তী সময় হইতে য়ুরোপীয়গণ ক্রমিক নানা দেশদেশান্তরে গমন ও ভারতবর্ষে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডের নরপতি সপ্তম হেনরি, গ্রীক ও লাটীন শিক্ষা প্রচলন জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। য়ুরোপখণ্ডের এই সময়টীকে এবং পরবর্ত্তী সময়কে জ্ঞানচর্চ্চার সময় বলিয়া অভিহিত করা হয়। পুরাকালে য়ুরোপীয়া কামিনীদিগের মানসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রকৃতরূপ চিত্র বোধ হয় য়ুরোপীয়দিগের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে সন্তোষজনকরূপে সমঙ্কিত নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলীতে আর্য্যা মহিলাদিগের অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা অবগত হই, খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে—সামন্ত্যশাসনসূত্রে (Feudalism) এবং জাতিমধ্যে জ্ঞানশিক্ষার চর্চ্চায় য়ুরোপীয়া রমণীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কিরূপ অবস্থা হইতে উন্নতিমূলক অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থা হইয়াছেন, তাহার সবিস্তার বিবরণী আমরা পাঠ করি নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা একরূপ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, পুরাকালের ভারতীয়া ললনাদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না, কারণ প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনায় এ বিষয়ের সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। বলা হইয়াছে, নরনারী উভয়ের মানসিক বৃত্তির উদ্দীপন সর্ব্বকালেই লক্ষিত হয়। ইহা স্বভাবের নিয়মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও প্রাচীন ভারতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হয় নাই ও মনুষ্যদিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন একরূপ দুর্গম ছিল, তত্রাচ অন্যান্য ঘটনা সমূহের সূচনায় ও বাহ্যিক অবস্থা অসন্তোষজনক দৃষ্ট হইলেও ভারতললনাদিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সংসাধিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃশ্যমান। ব্রাহ্মণশ্রেণী যে নিয়ম অনুসারে সমাজ মধ্যে বিরাজমান, তাহা চিন্তার সহিত ধীরভাবে দেখিলে বোধগম্য হয় যে, উক্ত শ্রেণীর জীবিকা ও ভাগ্য, সমাজস্থ সর্ব্বশ্রেণীর উপর নির্ভর করিতেছে; অন্ততঃ তৎকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই উভয় বর্ণের উপর বিশেষ

রূপে নির্ভর করিত। যদিও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে শূদ্রদিগের উপর ঘৃণাজনক ও অবজ্ঞাসূচক ভাব লক্ষিত হয়, তত্রাচ সমাজতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ সামাজিক কার্য্যে শূদ্রদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের বিভিন্ন নগর মধ্যে প্রবেশ ও আর্য্যধর্ম্মের বিস্তার, এইগুলি চিন্তার সহিত ভাবিয়া দেখিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। যাঁহারা বৈষ্ণব ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মনীতি কিরূপ প্রবলভাবে সমস্ত নরনারীকে পুরাণ, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি পুস্তকের মূলনীতিগুলি শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। বাস্তবিকই নৈতিক শিক্ষা নারীদিগের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল যে, এমন কি পর্ণশালানিবাসিনী দুঃখিনী কৃষক-পত্নী হইতে সুরম উচ্চ হর্ম্ম্যাবলীবাসিনী ধনবতী মহিলাগণ পর্য্যন্ত মহাভারতের দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ ও অন্যান্য মূলনীতিগুলি, রামায়ণের গভীর নৈতিক উপদেশ ও ভগবদ্গীতার মনুষ্য জীবনের উচ্চ প্রশ্নগুলি পরিজ্ঞাত আছেন। কথকতা সূত্রে জনসাধারণ মধ্যে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা বিশেষরূপে হইয়াছিল। যাঁহারা "কথাসরিৎসাগর" নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, যদিও উক্ত পুস্তক উপন্যাস কথায় পরিপূর্ণ কিন্তু পুরাকালে উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-কন্যা হইতে ঘৃণিতা বারবণিতা পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলনে নারীদিগের মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক স্বত্বের উন্নতি সবিশেষ পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের আমোদ প্রমোদমূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আচার বিধি দৃষ্টে কে না স্বীকার করিবে যে, ভারতীয় ললনাগণের অবস্থা তৎকালে উন্নতিমূলক ছিল? য়ুরোপীয় মনীষীগণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রচলনে য়ুরোপীয় কামিনীদিগের অবস্থার উন্নতির মূল বলিয়া গণনা করেন, সেই খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব য়ুরোপখণ্ডে তৎকালে সবে মাত্র অল্পে অল্পে দৃশ্যমান হইয়াছিল। এমন কি উন্নতির আনুষঙ্গিক বিলাসিতাও ভারত-সমাজে দেখা দিয়াছিল। আর্য্যা ব্রাহ্মণ মহিলাগণ অপরাপর বর্ণের মহিলাদিগের ধর্ম্মশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইত এমত বলা

যাইতে পারে। সম্ভ্রান্তা মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বিশেষ পরিমাণে প্রচলিত ছিল, এরূপও লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের সাম্য ও অভেদভাব প্রচার ভারতে মনুষ্যের স্বত্ববিপ্লবের চূড়ান্ত পরিচায়ক। বৈষ্ণবীগণ, পুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীনভাবে এক সময়ে সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অনবরত ক্রমিক বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ, অরাজকতা, অশান্তি, এই সকল ঘটনা সূত্রে ভারতবাসীগণের মানসিক, নৈতিক, শারীরিক সকল বিষয়েরই অবনতির চিহ্ন দেদীপ্যমান। প্রাচীন দুই একটী লক্ষণের চিহ্ন যাহা অদ্যাপিও সমাজ মধ্যে বিরাজিত, তদ্দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, অদ্যাবধি ভারতীয় হিন্দু মহিলাগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন। সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেণীর মহিলা অদ্যাবধি পুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে গঙ্গাস্নান করিতেছেন। যদিও প্রকাশ্যভাবে মহিলাগণ, পুরুষদিগের সহিত গঙ্গাস্নান করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও অনুমোদিত নহে, কিন্তু অনুমান হয়, পুরাকালে মহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা ছিল। জাতির অবনতির সহিত হিন্দুসাধারণে এ বিষয়টী দেখিয়া, উপলব্ধি করিয়া ও অভাব বুঝিয়া নিশ্চেষ্টপ্রায়। সংক্ষেপে এমত নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, তৎকালে সমাজের অভাব বুঝিয়া নারীদিগের সময়োপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সমাজের অভাব ও সময়োপযোগী শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়, এরূপ অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, ইহাদিগের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী যাহা চিন্তা করেন, তাহা দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পণ্ডিতদিগের মতবাদ এসম্বন্ধে পরস্পর অনৈক্য বলিয়া বোধ হয়। লা ব্রিয়ার, স্ত্রীলোকদিগের মানসিক তেজ দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। মহামনীষী প্লেটো এরূপ বিশ্বাস করেন, নরনারীদিগের মধ্যে শারীরিক সামর্থ্য ব্যতীত অন্য

কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সমাজতত্ত্ববিদ্ চিন্তাশীল ভলটীয়ার এরূপ বিবেচনা করেন যে, উদ্ভাবনী শক্তি ব্যতীত স্ত্রীলোকগণ অন্য কোন বিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন নহে। প্রগাঢ় পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল কহেন, নরনারীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা শিক্ষার অভাব সূত্রে হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কোন হোমর ও এরিষ্টটল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, উক্ত পণ্ডিত ও কবির ন্যায় প্রতিভাশালিনী নারী লক্ষিত হইবে না, এমত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। সিডনি স্মিথ কহেন, নরনারীর মধ্যে মানসিকবৃত্তি বিষয়ে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; যাহা কিছু লক্ষিত হয়, তাহা চর্চ্চার অভাবে বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞ কুইণ্টিলিন কহেন, যে বালকের স্বভাবের মধ্যে বক্তার লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাকে তীব্র প্রকৃতি ও সুমিষ্টভাষিনী ধাত্রীর অধীনে রাখা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতবর থিমষ্টিকল্ এইরূপ কহিতেন, যদিও তিনি সমগ্র গ্রীকরাজ্য শাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে শাসনে রাখিতেন। মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত প্রবর আরিষ্টটল কহিয়াছেন যে, গ্রীক রমণীগণের দেশের শাসনশক্তির উপর যথেষ্ট আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। প্রসিদ্ধা হানা মুর নাম্নী য়ুরোপীয়া রমণী এই মর্ম্মে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের স্বার্থের সমর্থনে মতবাদ প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রকৃত স্বার্থ ও সুখের বিষয়ে অন্ধ হইয়া, স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যে সুন্দর গুণগুলি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নবীন মতবাদের প্রচলনে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। প্রসিদ্ধ ডিউগল্ড ষ্টুয়ার্ট ও অপরাপর দর্শনিকগণ এই মর্ম্মে কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের বিভিন্ন অবস্থা কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে বিষদৃশ লক্ষিত হইতেছে, এমত নহে, উহাদিগের শারীরিক গঠনপ্রণালীতেও লক্ষিত হয়। কোমল গঠন সূত্রে স্ত্রীলোকদিগের করুণ মানসিক বল প্রবল— যাহাকে পণ্ডিত সেগেল আত্মস্বরূপ গণনা করিয়াছেন। এই গঠন দৌর্ব্বল্যের কারণই ধীর এবং অবিশ্রান্ত লক্ষ্য শক্তির অভাব উপস্থিত

করিয়া দেয় ও তাহাকে হানা মুর স্ত্রীজাতির মানসিক অসম্পূর্ণতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য-কল্পনাশক্তি এবং স্মরণ শক্তি অতীব প্রবল এবং সমালোচন, বিশ্লেষণ এবং সংমিশ্রণ শক্তির অভাব লক্ষিত হয়। কোন কোন চিন্তাশীল লেখক এরূপ কহেন যে, কয়েকটী বালক ও বালিকার স্বভাব দৃষ্টে বালিকার বুদ্ধিশক্তি প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। উহাদিগের মনের মধ্যে এরূপ শক্তি বিরাজমান যে, কোন অভাবনীয় বিপদ ও আসন্ন কর্ম্ম অতি চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থা হয়। তাহাদিগের এরূপ পছন্দশক্তি বিরাজমান যে, কোন বিষয় একবার দেখিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারতম্য করিতে পটু। উহারা পুরুষদিগের ন্যায় যুক্তি ও তর্কে অধিক কাল ক্ষেপণ না করিয়া, কার্য্য সাধনে সমধিক তৎপর হয়। ইহারা মনুষ্য-চরিত্র অতি সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারে ও মনুষ্যদিগের আচরণ ও মানসিক ভাব অতি সহজেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের মানসিক বৃত্তিসমূহের পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্যক তাহা নহে, তাহাদিগের মনোমধ্যে যে সমুদয় সুন্দর নৈতিক বৃত্তি নিস্তেজভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ও যেগুলি প্রস্ফুটিত হইলে, নারীদিগকে প্রকৃত সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করে, সেই গুলির চর্চ্চা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেখা যায়, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য চিন্তাশীল কবিগণ স্ত্রীচরিত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন ও যাহা অদ্যাবধি সমগ্র শিক্ষিত মানবমণ্ডলীর নিকট প্রশংসাজনক ও আদরণীয় হইয়াছে, সেই স্ত্রীচরিত্রের গুণগুলি কেবলমাত্র নৈতিক ও কর্ত্তব্য পালনের উপর বিরাজিত রহিয়াছে। বাল্মিকীর সীতাকে এপর্য্যন্ত কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বামীদিগের প্রতি আচরণ পাঠে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। কালিদাসের শকুন্তলার বিনয়নম্রলজ্জাশীলতা এবং সৎপ্রকৃতি অদ্যাপি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। সাধ্বী সাবিত্রী দেবী ও দময়ন্তীর কাহিনী অদ্যাপিও ভারতীয় ললনাগণকে সতীত্ব-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ প্রধান ধর্ম্ম-

যাজক কহিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগতের এঙ্গ্রোমেকির (Angromachi) স্বীয় স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন-বর্ণনাসূত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্য অতি সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আটিক (Attic) দিগের প্রধান কবি, এন্টিগণের (Antigone) প্রগাঢ় পিতৃভক্তি ও সৌভ্রাত্রভাবের চিত্র অঙ্কন দ্বারা তাঁহার কবিতাকে অতি সুমধুর করিয়া তুলিয়াছেন। প্রধান ইটালীয় কবি একমাত্র তাঁহার কল্পনাসম্ভূতা বিয়াট্রিসকেই(Beatrice) স্বর্গের যোগ্যপাত্রী বিবেচনা করিয়াছেন। ইংরাজদিগের প্রধান কবি সেকস্‌পিয়র, রাজা লিয়রের বালস্বভাবসুলভ অসার গর্ব্বের(Childish vanitly)সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা করডেলিয়ার দেবীর ন্যায় অটল পিতৃভক্তি, লিয়ারটেসের, (Leartes) অন্যায় ঈর্ষার সহিত হারমিয়োনের সহিষ্ণুতা, ক্লডিয়নের ভীরুতা ও কাপুরুষতার সহিত ইসাবেলার উজ্জ্বল পবিত্রতা তুলনা করিতে কখনও ক্লান্ত হন নাই। অন্য পক্ষে ওথেলোর (Othello) সমগ্র উপাখ্যানটী ইমিলিয়ার শেষ কাতরোক্তিতে প্রকাশমান;—রে মূঢ় দাম্ভিক হত্যাকারী! তোর মত নির্ব্বোধ পুরুষের হস্তে এরূপ স্বাধ্বী পবিত্রা স্ত্রী কেন পড়িল? উৎকৃষ্ট ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃত রমণীর বর্ণনা করিতে গিয়া কহিয়াছেন যে, তাঁহারা পুরুষদিগকে সতর্ক করিবার জন্য, সুখশান্তি প্রদান জন্য এবং পরিচালন জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন।

নারীজাতির চরিত্র যে সদ্‌গুণরাজিতে সুশোভিত হইলে,প্রকৃত সৌন্দর্য্যও মধুরতায় পরিণত হয়, বাল্মিকী, সেক্সপিয়র, দান্তে, কালিদাস এবং হোমর প্রভৃতি মহামহা চিন্তাশীল কবিগণ, কেবল সেই সকল সদ্‌গুণ কল্পনাবলে স্বস্ব গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন মাত্র—তাঁহাদিগের বর্ণনা কেবল কবিতারূপ প্রভায় প্রভান্বিত। বর্ত্তমান শিক্ষিতমণ্ডলী এইগুলির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া, ধর্ম্ম, নৈতিক ও জাতির সংস্কার প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বড় ভাল হয়। সকল দিক দেখিয়া কার্য্য করিলে, ক্ষোভের কোন আশঙ্কা থাকে না। অন্যপক্ষে তদ্দ্বারা আশাতীত ফল সংগৃহীত হয়। ইহা একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আচরণ কর্ত্তৃক মনুষ্যের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু সেই আচরণের শিক্ষা

আপনাপন আলয় হইতেই লাভ হয়, অতএব যাহাতে আলয় মধ্যে সুরীতি নীতি প্রচলিত, শান্তি, পবিত্রতা, প্রীতি ও স্নেহ বিরাজিত থাকে, তৎ-প্রতি সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতবর স্মাইল সাহেব যথার্থই কহিয়াছেন, যাহাতে আলয় মধ্যে সুপরিচ্ছন্নতা ও মিতব্যয়িতা, উত্তমরূপে সন্তান লালন পালন ইত্যাদি অতি আবশ্যকীয় সাংসারিক বিবিধ জ্ঞান জন্মে, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা মধ্যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি এরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, এরূপ জ্ঞান লাভ হইলে, প্রত্যেক আলয় মধ্যে প্রকৃত সুরীতি নীতি, স্নেহ, প্রীতি, ভাল-বাসা বিরাজ করে। দেখা যায়, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মপ্রচারক গণ, মহিলাদিগকে সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগী হইতে বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সংসারই স্ত্রীলোকদিগের রাজ্য, অতএব এই রাজ্যশাসন ভারগ্রহণ করিতে হইলে, তদুপযোগী শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা প্রদানে উপেক্ষা করেন ও এরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন যে, উহা নীচ কার্য্য, তাঁহারা বোধ হয়, সমাজের এক বিষয়ে প্রকৃত অন্ধ হইয়া সেরূপ কহিয়া থাকেন। কারণ পণ্ডিতগণ যথার্থই কহিয়াছেন যে, কোন প্রকার কর্ম্মই হেয় নহে, যদি না উহা হইতে কোন সমাজের ও ব্যক্তি বিশেষের অমঙ্গল সাধিত হয়। সংসার হঠাৎ দেখিলে, যেমন "কিছুই নহে" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু উহার ফলাফলের উপর লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হয় যে, সমাজের উন্নতি আল-য়ের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আমাদিগের স্বভাব মধ্যে এরূপ লক্ষিত হইতেছে যে, আমরা (নরনারী) উভয়ের প্রিয়পাত্র হইতে আকাঙ্ক্ষা করি ও পরস্পরের সুখ সাধনে সতত যত্নবান্ থাকি। এই সুন্দর কমনীয় ভাব হইতেই সংসারের সৃষ্টি হইতেছে। প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ, সংসার হইতে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যকে সংসারের প্রতি মমতা আকর্ষণ করাইতেছে, সৌন্দর্য্যে পরিণত করিতেছে, আলয় মধ্যে দেবভাব বিস্তৃত করিতেছে, প্রাচীন পূজ্য ঋষিগণ আহা! কি মধুর কথাই না উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—যথায় স্ত্রীলোকগণ পূজীত হয়, তথায় দেবগণ

সম্মানিত হয়েন। যেরূপ উদ্ভিদ্‌দিগের জীবনরক্ষা ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত কথঞ্চিৎ পরিমিত ভূমি, আলোক, সুবিমল বায়ু ও নির্ম্মল বারির প্রয়োজন, সেইরূপ নরনারীর মধ্যে প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, সম্মাননা ও প্রকৃত রূপে মনোবৃত্তির উৎকর্ষতা সাধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। সন্তোষের বিষয় সভ্যজগতের সকল সময়ের সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান মহিলাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ভারত-ললনাদিগের অপূর্ব্ব আদর্শ জীবনী হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে অনেক শুভফল লাভ হয়, এমত আশা করা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যা ললনাদিগের স্বামীভক্তি, নৈতিক সাহস, পবিত্র জীবনীর আলোচনায় শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। রাজপুতমহিলাদিগের সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন ইতিহাসে অতি মধুরভাবে বিবৃত আছে। বঙ্গীয় মহিলাদিগের বর্ত্তমান সমাজবিপ্লবেরসময় আত্মনির্ভর, নৈতিক সাহস, প্রবল চরিত্র-তেজ ও অন্যান্য সদ্গুণ গুলির উৎকর্ষতা সাধন অতি আবশ্যক, কারণ তদ্দ্বারা অনেক মঙ্গলজনক ফল প্রসূত হইবেক।

"শিক্ষা" এ কথাটীর ব্যাখ্যা সমাজের এত জটিল ও কূট প্রশ্ন ও বিধি-গুলির উপর নির্ভর করিতেছে যে, সে গুলি সম্যক পরিমাণে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোনরূপ মতবাদ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। নরনারীর মানসিক উৎকর্ষতা আবশ্যক, কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে তাহা হওয়া কর্ত্তব্য এ বিষয়ে মতবাদ প্রকাশ করা বড় সহজসাধ্য নহে। তবে এমত প্রকাশ করিলে বোধ হয় ধৃষ্টতা হয় না যে, এ বিষয়ের আলোচনায় জাতির আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইলে ও সেইসঙ্গে সমাজের আবশ্যকীয় সময়োপযোগী অভাব বুঝিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, কোন অনিষ্টজনক ফল প্রসূত হয় না। অর্থাৎ কোন অদ্ভুত সৃষ্টি না করিয়া, সমাজের বিধিগুলিকে পুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইলে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। যাঁহাদিগের উপর সমাজের এবং জাতির ব্যক্তিগত সুখ এবং সচ্ছন্দতা, পবিত্রতা, শান্তি

অনেকটা নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন বিষয়ে তৎপর হইলে, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ঘটে এবং আমাদিগের পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালিত হয়।

ভাবী আশা।

কি চেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থেরই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। উন্নতি ও অবনতি, পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের পরিচায়ক, সুতরাং মনুষ্য-জাতিও এই নিয়মের অধীন। ইতিহাসের আলোচনায় জানা যায়, জাতির উন্নতি ও অবনতি চিরস্থায়ী নহে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। কোন একটী জাতির অবনতি হইলে, সেই জাতির জীবন উন্নতি-মুখে আর প্রবাহিত হয় না, এই কথাটী বলা দুরূহ। দেখা যায় কেহ কেহ এপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাতি অবনতি-মুখে পতিত হইলে, আর তাহার পুনরুত্থান সম্ভবে না। কিন্তু এরূপ মতবাদ কতদূর সত্য, তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন জাতিসমূহের অবস্থা রীতিমত চিন্তার সহিত আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। যদিও প্রাচীন জাতিসমূহের আলোচনায় কেবল মাত্র তাঁহাদিগের সেই সময়ের অবস্থার তথ্য অবগত হওয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় এরূপ আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে, এ বিষয়ে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট মতবাদের বশবর্ত্তী হওয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। অধিকন্তু এ বিষয়ের আলোচনায় আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কি সমস্ত কারণে ও কি সূত্রে জাতির অবনত দশা ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ের যতই আলোচনা করা যায়, ততই মহাঘোর সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন জাতি বা কোন ব্যক্তিবিশেষকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করা একেবারেই অনুচিত। বিশেষতঃ জাতি আপন জাতিকে ঘৃণা করিলে বড়ই মনে ক্ষোভের উদয় হয়। কারণ মনোমধ্যে সদাই উদিত হইতে থাকে যে, মনুষ্য-সম্পাদিত কর্ম্ম অপর মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কি সূত্রে কি ঘটে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতেপারি না। ফলাফল দেখিয়া আমাদের মতবাদ সংগঠিত হয়। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে আমাদিগের নেত্রপথে এরূপও লক্ষিত হয় যে, পিতা অধার্ম্মিক ও মূর্খ, অথচ সন্তান ধার্ম্মিক ও বিদ্বান। সহসা কোন বিষয়ে নৈরাশ হওয়া

কিছুই নহে, কারণ মিসেস জ্যামিসন যথার্থই কহিয়াছেন, উহা কেবল মাত্র মানসিক দৌর্ব্বল্য ও কুশিক্ষার পরিচয় দান করে। আজকাল অনেকে-রই—এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই যে, বাঙ্গালী-দিগের বলবান ও সাহসী হইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকট কতই না শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশ্য বর্ত্তমান বঙ্গবাসীসাধা-রণের বাহুবল অপর শিক্ষিত সভ্য জাতিবৃন্দের বাহুবলের সহিত তুলনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, অপর জাতি বাহুবল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বঙ্গবাসী কি চিরদিনই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া কাল হরণ করিবে? কিছু মাত্র কি যত্ন চেষ্টা পাইবে না? এ সম্বন্ধে অর্থাৎ বাঙ্গালীর বাহু-বল ও সাহস বিষয়ে চিন্তাশীল ভারত-ইতিবেত্তা স্যার উইলিয়ম হণ্টারের উক্তিগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে আমাদিগের অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। তিনি এই মর্ম্মে কহিয়াছেন যে, "এক সময়ে যে ভীরু আর্মেনীয়দিগকে জয় করিতে বীর লকিউলাস ও পম্পি লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, তাহারাই আবার সপ্ত শতাব্দী পরে প্রবল ক্ষমতাশালী পারস্য সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস করিয়াছিল। যিনি জাতির বিপ্লবের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহার নিকট কোন জাতির অভ্যুত্থান বিষয়ে নৈরাশ হওয়া কেবল মাত্র অধীরতার কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। এবং ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গবাসীসমূহের জলযুদ্ধে সাহস ও অন্যান্য জাতীয় জীবনের লক্ষণগুলি উন্নত ও পরিপুষ্ট হইবার সুবিধাও আশাজনক বলিয়া বোধ হয়।"* উপরি উদ্ধৃত চিন্তাশীল বিবেচক স্যার

* The unwarlike Armenians whom Lucullus and Pompey blushed to conquer, supplied, seven centuries later, the heroic troops who annihilated the Persian monerchy in the height of its power. To any one acquainted with the revolution of races, it must seem mere impatience ever to despair of a people ; and in maritime courage, as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them under British rule. [Hunter's Orissa. Vol. I p. 315.

উইলিয়ম হণ্টার সাহেবের বঙ্গবাসীর বাহুবল ও সাহস সম্বন্ধে উক্তিটি বড়ই সন্তোষপ্রদ ও উৎসাহপূর্ণ। বাস্তবিকই মনুষ্যবৃন্দ, কি অবস্থা হইতে কি উচ্চ অবস্থায় আরোহণ করিতেছেন, আবার কি উচ্চ অবস্থা হইতে কি অধঃস্থলে পতিত হইতেছেন, এই গুলির প্রতি দৃষ্টি দান করিলে আমাদিগের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিবার কোন হেতু থাকে না। যে সমুদয় বৃত্তিবীজ বপনে ও উহা অঙ্কুরিত হইলে, জাতির উন্নতির চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়, দেশ মধ্যে তাহা এখন দেখা দিতেছে। যদিও বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ও উহার মীমাংসা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, তত্রাপি আমাদিগের সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, দেশ মধ্যে ইংরাজ-শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষায় ও য়ুরোপীয়দিগের সহবাসে দেশ মধ্যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন চলিতেছে। সামাজিক ও নৈতিকবিপ্লব এখন দেশ মধ্যে দৃশ্যমান। কোন্ পথ ছাড়িয়াছি, কোন্ পথ মধ্যে অবস্থান করিতেছি ও কোথায় উপনীত হইব, ধীরভাবে চিন্তার সহিত অনুধাবন ব্যতীত তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। দেশ মধ্যে এখন সম্পূর্ণ এক নূতন ভাব দেখা দিয়াছে। আমাদিগের জীবনের পথ কর্ম্মক্ষেত্র নানাবিধ হইয়াছে; সকলেরই আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আশালতা শাখা-প্রশাখায় আমাদের হৃদয়কুঞ্জকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যেন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায় দেশ মধ্যে নৈতিক ভাব ভিতরে ভিতরে উদ্দীপন হইতেছে—যেন আমাদিগকে নূতন অবস্থায় নূতন ভাবে আনয়ন করিতেছে। মনুষ্য যেরূপ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন পরিধেয় ধারণ করেন, সেইমত আমরা নব নব ভাবে নব নব আশায় ও নানা প্রকার উৎসাহে উত্তেজিত হইতেছি। বস্তুতঃ দেশ মধ্যে কি অভূতপূর্ব্ব মহাকাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একবার চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দেখিলেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উন্নত জাতির অনুসরণে অপর জাতি উন্নতিমুখে অগ্রসর হয়। নানা দেশের দেবতুল্য মহাত্মাগণ ও

জ্ঞানবিস্তারকেরা যেন আমাদের উন্নতির পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উক্তিগুলি ও উপদেশ অনুসারে শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাঁহাদিগের সমাজকে উন্নতিমুখে উত্তোলন করিতে যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিতে যেন উদ্যোগী হইয়াছেন। জগতের নানা প্রান্তের মানব-হিতসাধক সমূহের অসাধারণ পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, অমানুষিক সাহস ইত্যাদি প্রশংসনীয় গুণগুলি যেন আমাদিগের ধ্রুবনক্ষত্রস্বরূপ হইয়াছে। এখন সমাজের প্রতি শুভজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে উহা প্রচার করিবার নিমিত্ত আয়াস ও তাহা অনুকরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা দেশ মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। এই সকল ও নানাবিধ শুভসূচক ঘটনা জাতির অভ্যুত্থান নিমিত্ত অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে। সময়স্রোত এখন আমাদের অনুকূলে বহিতেছে। চারিদিকের অবস্থা অতীব প্রীতিপ্রদ। শান্তি দেশ মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ভাবী আশা উৎসাহে পরিপূর্ণ। লোকের এখন চিন্তা করিবার—জ্ঞানালোচনা করিবার ও জ্ঞান শিক্ষার সময় উপস্থিত। সত্যের আদর, ধর্ম্মের অনুশীলন, যুক্তি ও জ্ঞানের প্রাধান্য ও আদর যেন অল্পে অল্পে দেশ মধ্যে অধিকার বিস্তার করিতেছে। দ্বেষ, বৃথা কলহ, কুহিংসা যেন তিরোহিত হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে জাতির অভ্যুত্থানের মূলসূত্র গুলি ও আদর্শ তাহাদিগের কার্য্য অপেক্ষা উন্নত বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে লোকের আগ্রহ হইয়াছে। মানসিক শক্তির উৎকর্ষতা চারিদিকে লক্ষিত হইতেছে। উদ্যমের চিহ্ন চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইতেছে। স্বাধীন ভাব ও সেই সূত্রে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বাধীনতার কথা দেশ মধ্যে উঠিতেছে।

এই সকল ঘটনায় বঙ্গীয় সমাজ মধ্যে নবীন ভাবের উদ্রেকে জাতির প্রকৃত শিক্ষা ও সেই সূত্রে সমাজ মধ্যে যে কোলাহল দৃশ্যমান, তাহা আমাদিগের অনুভবশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রম সংস্কারে পরিণত করিতে পারে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মনুষ্য মধ্যে যে সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, কত ধূর্ত্ত ও প্রতারক তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়

দানে ইন্দ্রজালবিদ্যার দ্বারা লোক সমূহকে মুগ্ধ করিত। বিজ্ঞানের প্রচলনে এখন অনেকেই সেই সকল অদ্ভূত ও আশ্চর্য্য ঘটনা আপনা আপনি সম্পাদন করিতে সমর্থ। এখন আর সেই কার্য্যগুলি পিশাচ-সিদ্ধ ও অদ্ভূত বলিয়া লোকের বিশ্বাস হয় না। যে সময়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন দেশ মধ্যে হইয়াছিল, সেই সময়ের নবীন শিক্ষিতেরা হিন্দুসমাজ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এই ভ্রমে কত প্রকার ঘৃণাসূচক ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট এমন কি আমরা পর্য্যন্ত অনুতাপের কথা শ্রবণ করিয়াছি। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দেশ মধ্যে জাতির অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের লোপ হইবে, তাঁহাদিগের মতবাদ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা কহিতে চাহি না। কারণ যদ্যপি হিন্দুধর্ম্ম জাতির উন্নতি ও প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানের রোধকর বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে উক্ত হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপে কাহারও কোন প্রকার প্রকৃত আক্ষেপের কারণ নাই। মনুষ্যবৃন্দ বস্তুতঃ এতদূর জ্ঞান-বিবেক-শক্তিহীন হয়েন নাই যে, তাঁহারা ভালমন্দ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অন্য পক্ষে প্রশ্ন উঠিতে পারে হিন্দুজাতির ধর্ম্মাচারপ্রণালী কি যথার্থই অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ ভাবের উপর নিহিত? যথার্থই কি হিন্দুধর্ম্ম অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন বর্ব্বর মনুষ্যদিগের ভিতর প্রচলিত? সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে হিন্দুধর্ম্ম অচিরেই জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত এমত কোন মতবাদ প্রকাশ করেন নাই, ভবিষ্যতে হিন্দুজাতি কি ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতবাদের পরিচয় এ পর্য্যন্ত জগতকে দিতে পারেন নাই। যিনিই যাহাই বলুন, এ বিষয়ে একটু চিন্তাক্ষেপ করিলেই—অপরাপর জাতির ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, দেশমধ্যে প্রকৃত মতবাদের তথ্য লইলে, দেশমধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাবল্য অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হীন বলিয়া সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুসমাজ অনুভব করেন না। একথাটী আমাদিগের কাল্পনিক উক্তি নহে। যদি কেহ এককালীন দশ বৎসরের শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য কাব্য, উপন্যাস,

ধর্ম্মপুস্তক, নবন্যাস, সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদির আলোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষিত সকল সম্প্রদায় হিন্দুসাধারণ, জাতির দায়িত্ব অনুভব এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস, জাতির অভ্যুত্থানে জ্ঞানের বিকাশে ও মানসিক উৎকর্ষতায় হিন্দুজাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেছে। এখন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানবান, সাধু, চরিত্রবান লোক দেখা যাইতেছে। এখন কেবল কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু জাতির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে না। হিন্দুর বিবাহ প্রথা লইয়া যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল, জাতি এখন জাতির কথা লইয়া তর্ক করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে যে, জাতির অভ্যুত্থান হইতেছে না? জাতি, জাতির দায়িত্ব বুঝিতে পারিলে, জাতির কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে উদ্যোগী হয়। ইহা অল্প আক্ষেপের কথা নহে যে, আমরা চক্ষু খুলিয়া দেখিয়াও দেখিতে চাহি না। কর্ণে শ্রবণ করিতে বড়ই পটু। এ বিষয়ে আক্ষেপের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যেন হিন্দুসমাজ নীরব নিদ্রিত ও নিশ্চেষ্টপ্রায়। উদ্যমের কোন প্রকার চিহ্নই আমাদিগের চক্ষে লক্ষিত হইতেছে না। প্রায় সকলের মুখেই একপ্রকার বাক্য শুনিতে পাই—গৃহে বাহিরে সকল স্থানে যে, হিন্দু জাতি-সাধারণের অবনতির মূল কারণ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। বাস্তবিক আমাদিগের অবনতি কি কারণ নিবন্ধন ঘটিয়াছে, ইহার আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য ইতিহাসে পাঠ করা যায়, বঙ্গের শেষ নরপতি লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে বঙ্গের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যাধামে পলায়ন করেন। সপ্তদশ জন মুসলমান বঙ্গ অধিকার করে। অবশ্য ইহা আমরা সকলেই ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি ও এ বিষয়ে কেহ অন্যমত প্রদর্শন করিতে যাইলে, ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু কথা উঠিতেছে, সপ্তদশ ব্যক্তি কি করিয়া বঙ্গ অধিকার করিল? দ্বিতীয় কথা, রাজা লক্ষ্মণ সেনের কি প্রকার পরাক্রম ছিল, ইতিহাসে ইহার

উল্লেখ নাই। অবশ্য ইতিহাসে তাঁহার নাম উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, তিনি যথার্থ নরপতি ছিলেন, কি জমীদারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কারণ আমরা আবার ভারতেতিহাসেই পাঠ করি, বর্দ্ধমান অধিকার করিবার জন্য মুসলমানগণ আসিয়াছিল। আবার মহাকবি ভারতচন্দ্রের কবিতা পাঠে মনোমধ্যে এরূপ ধারণাও জন্মে যে, বর্দ্ধমানাধিপতি এক জন প্রকৃত পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। হণ্টার সাহেব-কৃত "অ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল" পাঠে অবগত হওয়া যায়, বীরভূমের জমীদারগণ নরপতি বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশ্য বহুদিনের কথা জানি না ও আমরা সর্ব্বজ্ঞ নই, ইংরাজ-অধিকৃত বর্ম্মা অধিকারের ন্যায়—রাজা থিবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ন্যায় মুসলমানদিগের দ্বারা বঙ্গ জয় হইয়াছিল কি না? কারণ এরূপ সন্দেহ হয়, কি করিয়া সপ্তদশ ব্যক্তি সমগ্র বঙ্গ জয় করিয়াছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যসীমা কত দূর অবধি বিস্তৃত ছিল, তাহার কিছু প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না। অন্য পক্ষে তাঁহার কর্ম্মচারীরা বিবিধ প্রদেশ গ্রাস করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহাকে নবদ্বীপের অধীশ্বর করিয়া রাখিয়াছিল কি না, ইহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদ্যপি তাঁহার রাজ্যসীমা স্থদ্ধ নদীয়া অবধি হয়, মুসলমানগণের দ্বারা তাঁহার নগরাক্রমণ ও উহাদিগের প্রভূত ক্ষমতা এবং তাঁহার রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া, ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ বিশেষ কিছু দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ বিপ্রগণ, কি অন্য সম্প্রদায়, কেহই কাশ্মীরের বর্ত্তমান সিংহাসনচ্যুত নরপতিকে ব্রিটিস সংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিবেন না। এক কথায় কোন সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেন, কি কারণ নিবন্ধন রাজা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি ইতিহাসেও এ বিষয়ের নানা প্রকার গোলমাল দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মতবাদ প্রকাশ করি না কেন, অপর সভ্য জাতিরা-তাহাদিগের পুরোহিতদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন, ইহা

রীতিমত চিন্তার সহিত ধীরচিত্তে আলোচনা করিলে, অনেক শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমান অধ্যাপকশ্রেণীর মানসিক অবনতির সংস্কার কতকটা শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া যত্ন এবং উৎসাহ দান ও পালন করিলে, আশা করা যাইতে পারে, পুনরায় তাঁহারা মানসিক উৎকর্ষতা ও সংস্কৃত চর্চ্চায় বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ ব্রাহ্মণগণের মানসিক তেজ—এমন কি এখনও পর্য্যন্ত সবিশেষ লক্ষিত হয়। হায়! এক সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকগণ মানসিক উন্নতির চূড়ান্ত পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সেই সকল অধ্যাপকের নাম আজি পর্য্যন্ত চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যেরূপ মতবাদ প্রকাশ করি না কেন, তাঁহারা অপরাপর সভ্য জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। মোক্ষমূলর সাহেব, ভট্ট উপাধিতে অভিহিত হইতে বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত ইংরাজ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান এবং উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। এ সম্বন্ধে ধীরচিত্ত বিবেচক হণ্টার সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম গৃহীত হইল।

তিনি এইরূপ কহেন, "ব্রাহ্মণগণ এ জগতের ইতিহাসের আদিম অবস্থায় আপনাদিগের জীবনযাত্রা যেরূপ নিয়ম প্রণালীতে পরিচালনা করিতেন, সেই নিয়ম প্রণালীর মূল লক্ষ্য—আত্মোৎকর্ষ সাধন এবং আত্মসংযম। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ তিন সহস্র বর্ষ হইতে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং পরিমিতাচারের ফলস্বরূপ; তাঁহারা অপরাপর অধিবাসী সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন। এমন কি ভারতে নবাগত পর্য্যটক, ধূসরকপোল, দীর্ঘবাহু, বিশ্রামপ্রিয় রাজপুত বা আর্য্যবংশোদ্ভব বীর জাতির মধ্য হইতে এবং কৃষ্ণচর্ম্ম, বিস্তৃতনাশা স্ফীতোষ্ঠ, অনার্য্যবংশোদ্ভব খর্ব্বকায় এবং গোলমস্তিষ্ক নিম্নজাতীয়গণের সহিত পৃথকরূপে সেই ব্রাহ্মণগণকে চিনিয়া লইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ

এই উভয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক, তাঁহারা, দীর্ঘাকার, নাতিস্থূল, রমণীয় রূপে গঠিত অধরোষ্ঠ এবং নাশা, গৌর বর্ণ, বিস্তৃত ললাট এবং ঈষৎ নারিকেলাকৃতি মস্তক—তাঁহারা সদাচারী। তাঁহারা বাহুবলে নহে, বংশানুক্রমিক শিক্ষা এবং সদাচার-বলে দেশের শাসনশক্তিসঞ্চালনকারী হইবার যোগ্যতশ্রেণীর আদর্শস্বরূপ। ভারতে এক জাতির পর অন্য জাতির ধ্বংস হইয়াছে, এক এক বংশের উত্থান এবং পতন হইয়াছে, দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম বিস্তৃত এবং পরে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের সেই উষা হইতে ব্রাহ্মণগণ ধীরভাবে শাসন করিয়া আসিতেছেন। মানবসমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার এবং অধিবাসী সাধারণের নিকট হইতে সম্মান অর্জন করিয়া আসিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশের জাতিসমূহ তাঁহাদিগকে ভারতীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মণগণ যে পদাধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা যে দেশের হিত সাধন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কম পরিমাণে সমুৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ কেবল পুরোহিত এবং দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহারা বিধানকর্ত্তা, বৈজ্ঞানিক এবং স্বজাতির কবি ছিলেন।”

হায়! বিদেশীয়গণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকমণ্ডলী পূজিত হইতেছেন অথচ শিক্ষিত স্বদেশীয়গণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইতেছেন, ইহা অল্প আক্ষেপের কথা নয়। যখন আমাদিগের হিন্দুসমাজে থাকিতেই হইবে, তখন আমাদিগের ইহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে, যাহাতে হিন্দু-সমাজের সকল সম্প্রদায় পুষ্ট (developed) হইয়া সমগ্র হিন্দু জাতিকে উন্নতি-মুখে উত্তোলিত করে। স্মাইল সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, কোন সমাজ পুষ্ট হইতে গেলে উক্ত সমাজস্থ শ্রমশীল উদ্যমী সচ্চরিত্র ব্যক্তি-বৃন্দের অপেক্ষা করে। থিয়োডোর পার্কার কোন স্থলে কহিয়াছেন, একক মহাত্মা সক্রেটিস, সাউথ কেরোলিনার ন্যায় অনেক রাজ্যের অপেক্ষা জগতের পক্ষে আবশ্যকীয়। ইংলণ্ডের মহামনীষী কারলাইল, মহাকবি সেকস্‌পিয়র অপেক্ষা যদি সমগ্র ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে সংস্কৃত ভাষার রচনা করিয়া গিয়াছেন,

আমি আমার কথা বলিতেছি না, কারণ আমি উক্ত ভাষার কিছুই জানি না, তবে য়ুরোপীয় মহামনীষীগণ উক্ত ভাষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে বিস্মিত হইতে হয় ও উক্ত ভাষার চর্চ্চার নিমিত্ত কৌতূহল হয়। সার উইলিয়ম জোন্স সাহেব সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কহেন যে, উহা অদ্ভূত প্রণালীতে গঠিত, গ্রীক অপেক্ষা অতি পরিষ্কার এবং লাটিন অপেক্ষা অধিক প্রচুর (copious) এবং উভয় অপেক্ষা সুপাঠ্য। মোক্ষমূলর সাহেব সংস্কৃত ভাষাকে ভাষার ভাষা বলিয়া অভি- হিত করেন। যদি উক্ত ভাষা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহাদিগের নিকট কি রূপ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ, তাহা বিবেচনা করা উচিত। যদি মহামনীষী কারলাইল সাহেব ভারতের ব্রিটিস অধিকার অপেক্ষা মহাকবি সেকস্- পিয়রকে অধিক গৌরবের মনে করেন, তাহা হইলে শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকট অন্ততঃ "Give me a penny for Belesarius the general" সৈন্যা- ধ্যক্ষ বেলিসেরিয়সের কারণ একটী পয়সা দাও, উক্তিটির ন্যায় তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, যত্ন ও পালন করেন এই রূপ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলী যে সমুদয় মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে, উক্ত ভাষার উপর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ও ব্রাহ্মণদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বঙ্গমাতার যোগ্যপুত্র খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অতি সামান্য পরিমাণে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইউরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইউ- রোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূল নির্ণয়, স্বরূপ পরিজ্ঞান ও মর্ম্মভেদে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান তাঁহাদের কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া

কোন প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।"

আমরা সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে যে কিছু পণ্ডিতদিগের মতবাদ প্রকাশ করিলাম, ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবলমাত্র যে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র কি না, ইহার আলোচনা করা। বঙ্গে যে নৈতিক ও মানসিক জগতে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের মহা অভিনয় চলিতেছে, সেই মহাবিপ্লবের সময় বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিসমূহ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে পুনরায় মানসিক উৎকর্ষতার চর্চ্চায় উৎসাহ দান পূর্ব্বক বঙ্গজগতে সুবিমল পবিত্র ধর্ম্মের আবার প্রচলন করাইয়া, উন্নতির নিশান জগত মধ্যে প্রোথিত করিবেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তি এমত আশা করে। উপসংহারে গভীর আশাপূর্ণ হৃদয়ে মহাভারত হইতে এইটী পাঠককে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম ঃ—

আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মের অনিত্যতা নিশ্চয় করিয়া ভগ্নোদ্যম হয়, সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি উভয়কেই প্রতিকূলবর্ত্তিনী করে। অতএব নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবেক, এইরূপ মনে করিয়া সতত অব্যথিতচিত্তে উদ্যমপরায়ণ হওয়া, কার্য্যসাধনে জাগরূক থাকা এবং মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

[উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩৫ অধ্যায়।]